

ବିଶ୍ୱାସ ମାଗଜିନ



ଏହିଲ-ଜୁନ '୨୨
ବିଶ୍ୱାସନ-ଛୁଲକନ୍ଦ



ବସାନତିକାଳେ

ଅର୍ଥବିଲ୍ୟା ବଳ

ବସାନତ ଚୋଲିକ ପ୍ରୋତ୍ସହ

ଡାକ୍ତରବିନୀମା ମୋଟା ଦିନ ଚାଲି

ଆକର୍ଷଣୀୟ ଯୋଗେବନିଯମିତ ଲ୍ୟାଫ୍ୟୋଜନ

ଆମର ଆଜିକୁ କାହାକୁ ହାଜୀର ତୋକାର ପୁରୁଷାର

ଜନ୍ମିପନ



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

নতুন ব্যাচ

আরবি ভাষা কোর্স

২০তম ব্যাচ, মেভেন-১

উচ্চায় কাওসার আহমাদ

প্রিয়াঙ্গা পরিচালক, আম-আসন ইলাজিটিউট
বি.এ. (জ্ঞান), এম.এ. বাইজেন্সিক ইউনিভার্সিটি এবং শাহবুক্ত,
মাঝে ইসলাম ইউনিভার্সিটি।
স্কুলজাত (কাউন্সেল) মেভেন, আরাফিক ফর নন-ন্যূটিশন
শিক্ষার্থীদের প্রয়োগ্য, কান্তিক ফরিদান ইউনিভার্সিটি।
সাধক অভিযোগ ম্যাকার্ডি,
বাণিজ্য ইউনিভার্সিটি এবং প্রকৃত্যানন্দে

মূল ক্লাস

৩২টা ক্লাস (৬৪ ঘণ্টা)

রিভিশন ক্লাস

১৬টা ক্লাস (৩২ ঘণ্টা)

বিশেষ সুবিধা

ক্লাসের সময়

কর্মসূচি (সকাল ৮:০০-১০:০০)

শনিবার (সকাল ১০:১৫-১২:১৫)

কুইজ এবং পরীক্ষা

কুইজ: ১৪ শট ট্রেন্স

১টা মিডটার্ম, ১টা ফাইনাল

ক্লাসের ধরন

অনলাইনে এবং ক্যাম্পাসে

যোগ্যতা শর্তাবলী

বেসিক কুরআন পড়তে পারা
মাঝে নেভেনের সাবলীলতা

ক্লাস শুরু

১৩ মে, ২০২২

বিস্তারিত জানার জন্য

www.alasrinstitute.com

fb.com/alasrinstitute

youtube.com/c/ALAsrinstitute/Playlists



AL-A'SR INSTITUTE

01755-700389, 01730-491505

www.alasrinstitute.com

alasrinstitute@gmail.com

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



মোলো এপ্রিল-জুন সংখ্যা, ২০২১
প্রস্তুতি ক মোলো

সার্বিক তত্ত্বাবধানে: মোলো
সম্পাদনা: লস্টমডেস্টি
প্রকাশনায়: সন্দীপন প্রকাশন

মোলো ফেসবুক পেইজ
facebook.com/SholoOfficial



লস্টমডেস্টি
www.lostmodesty.com
facebook.com/lostmodesty

মুক্ত বাতাসের খোঁজে ফেসবুক গ্রুপ
facebook.com/groups/lostmodesty.volunteers

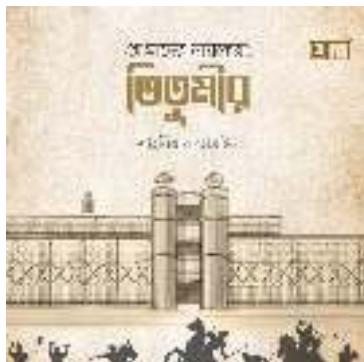
প্রাপ্তিহান:

সন্দীপন
প্রকাশন লিমিটেড
৩৪, মাদরাসা মার্কেট (২য় তলা)
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
মোবাইল : ০১৮০৬ ৩০০ ১০০

অনলাইন পরিবেশক:
ওয়াক্ফ লাইফ

মূল্য : ৭০ টাকা

অন্দরমহল



তাড়াছড়া
নষ্ট মডেল্স

০৫

জিম্মী! (শেষ পর্ব)
ফারহান মাহমুদ

০৮

মাসজিদ কথন
নষ্ট মডেল্স

১৩

আমাদের নায়কেরা : তিতুমীর
শাহরিয়ার হোসাইন

২০

দীপুর হিসেব
আলী আবদুল্লাহ

২৬

রমাদানের সুবাসে সুবাসিত হও!
আসাদুল্লাহ আন গানিব

৩৭

সাওম যেভাবে তোমাকে
সুস্থান্ত্য উপহার দেবে

৪৪

ঈদ
আহমেদ হোসাইন

৪৫

ডাক্তারখানা : মোটা হতে চাই!
নষ্ট মডেল্স

৪৭

কীভাবে অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জন করব?
- আরিফুন ইসনাম, সহপ্রতিষ্ঠাতা, ওয়াফিনাইফ

৫২

৫৬

পর্দা!
জিম তানভীর

৫৯

দুআ সিরিজ : কেউই তোমার
কোনো ক্ষতি করতে পারবে না।

৬০

বায়ু দূষণ!
তৌহিদ তিয়াস

৬১

স্বপ্নে হলো ভুল!
ডা. খানিদ সাইফুল্লাহ



৬৬

বুদ্ধি খাটাও

৬৭

যুমের তেতর-বাহির
মাহফুজ আনাম দিপু



৭০

ক্যালিগ্রাফি

৭২

খুলি মেঘের ভাঁজ (দ্বিতীয় পর্ব)
ওমর আনী আশরাফ

৭৫

কুইজে কুইজে সীরাত
ইন্ম হাউস

৭৬

মনোবিদ ভাইয়া,
সমস্যায় আছি!



৭৮

কবিতা, ছড়া

৭৯

রহস্যজট



ଆନଥାମଦୁଲ୍ଲାଷ୍ଟ!

ତୋମାଦେର ହାତେ ଯୋଲୋ ମ୍ୟାଗାଜିନେର ଆରା ଏକଟି ସଂଖ୍ୟା ତୁଲେ ଦେବାର ତାଓଫିକ ଦିଲେନ ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଳା। ଅଛି କେସନିମନ୍ଦିରର ମାଥାତେଇ ଯୋଲୋ ମ୍ୟାଗାଜିନକେ ତୋମରା ନିଜେଦେର ମ୍ୟାଗାଜିନ ହିସେବେ ଗ୍ରହଣ କରେ ନିଯେଛା। ଯୋଲୋ ମ୍ୟାଗାଜିନେର ପ୍ରତି ତୋମାଦେର ଭାଲୋବାସା ବରାବରଟ ଆମାଦେର ମୁଖ କରେ। ଆମାଦେର ପଥଚଳାର ଅନୁପ୍ରେରଣା ଦେ�ୟ।

ରମାଦାନ ମାସ ଆମାଦେର ଦରଜାଯ କଡ଼ା ନାଡିଛେ। ବଛରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାସ। ଜାଗାତି ସ୍ଵକ୍ଷିଦେର ଖାତାଯ ନିଜେର ନାମ ଉଠାନୋର ମାସ। ତୋମରା ଅନେକେଇ ରମାଦାନେର ସାଓମ ଥାକତେ ଭୟ ପାଓ। ଭାବୋ ଯେ, ପଡ଼ାଶୋନାର କ୍ଷତି ହବେ ବା ଶୁକିଯେ କାଠ ହସେ ଯାବେ। ଏଟା ଏକଦମ ଭୁଲ ଧାରଣା। ସାଓମ ଥାକଲେ ଯଦି ତୋମାର ପଡ଼ାଶୋନାର କ୍ଷତି ହତୋ ବା ତୋମାର ଶ୍ରୀରେର କ୍ଷତି ହତୋ, ତାହଲେ ଆଲ୍ଲାହ କଥନୋଇ ସାଓମକେ ଫରଯ କରତେନ ନା। ଆଲ୍ଲାହର ଓପର ଭରସା କରେ ସବଗୁଲୋ ସାଓମ ରାଖୋ। ଆଲ୍ଲାହ ବାରାକାହ ଦେବେନ ଇନଶାଆଲ୍ଲାହ। ଆର ବଲେ ଫେଲି ଏହି ଫାଁକେ କିଭାବେ ମୋଟା ହେଯା ଯାଯା, ତା ନିଯେ ଏକଟା ଲେଖା ଥାକଛେ ଏ ସଂଖ୍ୟାତେ!

ରମାଦାନ ଉପଲକ୍ଷ୍ୟ ଆମରା ତୋମାଦେର କିଛୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦିଚ୍ଛି। ତୋମାଦେର ବୟସଟାଇ ଏଥିନ ଏମନ ଯେ, ଯେକୋନୋ କିଛୁବ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ନିତେ ଭୟ ପାଓ ନା। ଅନେକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ନିଯେଛ ତୁମି, ସ୍କୁଲ ପାଲିଯେ ଖେଳତେ ଯାଓୟା, ଗେଟିମେର କୋନୋ ଲେଭେଲ ପାର କରା ବା ବିପଦଜନକ କୋନୋ କିଛୁ। ଆଜ ଆମରା ତୋମାକେ କିଛୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦିଚ୍ଛି। ଏହି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜଗୁଲୋ ତୋମାକେ ଆଲ୍ଲାହର ନିକଟବତୀ କରିବେ। ହସତୋ ତୋମାର ଜନ୍ୟ କ୍ରୟ କରେ ଫେଲବେ ଜାଗାତ। ତବେ ବଲେ ରାଖଛି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜଗୁଲୋ ଖୁବ ଏକଟା ସହଜ ହବେ ନା। ଅନେକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ତୋ ନିଯେଛ, ଏହି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜଗୁଲୋ କି ନେବେ? ଆହେ କି ହିସ୍ମତ?

ଚାଁଦ ରାତେଇ ଡିଜେ ଗାନ ବାଜିଯେ ଉଦ୍‌ଦାମ ନାଚାନାଚି, ପଟକା-ଆତଶବାଜି ଫୁଟିଯେ ଏଲାକାର ସବାଇକେ ଭାତ-ସନ୍ତ୍ରଣ୍ଟ କରେ ରେଖେ ଯେଣ ଶୁରୁ ନା ହୁଯ ତୋମାର ରମାଦାନେର ପରବତୀ ସମୟ। ରମାଦାନେର ଆମଲଗୁଲୋ ଅବ୍ୟାହତ ରାଖିବେ ରମାଦାନେର ପରେର ମାସଗୁଲୋତେও।

Ilmhouse Publication ଏର ସୌଜନ୍ୟେ କ୍ୟାଲିଗ୍ରାଫି ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ଆୟୋଜନ କରେଛିଲାମ ଆମରା। ସେହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ଫଳାଫଳ ଏବଂ ସେରା ୫୬ ଟି କ୍ୟାଲିଗ୍ରାଫି ଥାକଛେ ଏହି ସଂଖ୍ୟାତେ। ଥାକଛେ ଫେରସ୍ୟାରି-ମାର୍ଟ ସଂଖ୍ୟାର ବୁନ୍ଦି ଖାଟାଓ, ଗନିତ ଧାଁଧା ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ଫଳାଫଳତ୍ବ ବରାବରେର ମତୋ ଏ ସଂଖ୍ୟାତେଓ ଥାକଛେ ରମ୍ୟଗଙ୍ଗା, ଥିଲାର, ଛଡ଼ା, କବିତା, ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ, କାଉସ୍ଲେଲିଂ, ସୀରାତ ଇତ୍ୟାଦି ଚମକାର ଚମକାର ସବ ଲେଖା। ଓ ହଁଁ, ଯୋଲୋର ନିୟମିତ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ରହସ୍ୟ ଜଟ, ସୀରାତ କୁଇଜ, ବୁନ୍ଦି ଖାଟାଓ ଏସବାନ୍ତ ବାଦ ପଡ଼େନି। ସୁତରାଂ କମେକ ହାଜାର ଟାକାର ପୁରକ୍ଷାର ଜିତେ ନେବାର ସୁଯୋଗ ଏ ସଂଖ୍ୟାତେଓ ଥାକଛେ।

ଯୋଲୋ ତୋମାଦେରଇ। ଯୋଲୋକେ ଏଗିଯେ ନିଯେ ଯେତେ ହବେ ତୋମାଦେରକେଇ। ଲେଖାଲେଖି, ଲେଖାଲେଖିର ବିଷୟବସ୍ତ ନିର୍ବାଚନ, ଭିଡ଼ିଓ ଏଡ଼ିଟିଂ, ଫଟୋ ଏଡ଼ିଟିଂ, କମିକସ, କୋନୋ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ଆଇଡ଼ିଆ— ଏକକଥାଯ ଯୋଲୋର ଉତ୍ସତିର ଜନ୍ୟ ଯା ଯା ଦରକାର ମନେ କରୋ, ଜାନାତେ ଭୁଲୋ ନା। ନକ ଦାଓ ଯୋଲୋର ଫେସ୍‌ବୁକ ପେଇଜେ- <https://web.facebook.com/SholoOfficial> ଅଥବା ଇମେଲ କରତେ ପାରୋ ଏହି ଠିକାନାୟ- editor.sholo@gmail.com

ତୋମାଦେର ଜନ୍ୟ ଅନେକ ଅନେକ ଭାଲୋବାସା ଓ ଦୁଆ ରଇଲା। ଆମାଦେର ଜନ୍ୟେ ଦୁଆ କରତେ ଭୁଲେ ଯେଯୋ ନା।

ଓୟାସ ସାଲାମ...

ଯୋଲୋ ଟିମେର ପକ୍ଷେ,

ନୟଟ ମଡେଟି



ତାଙ୍ଗରଙ୍ଗ

ଲସ୍ଟ୍ ମଡେସ୍ଟ୍



সকল কাজে তাড়াছড়ো করার অভ্যাস আমার। এজন্যে কতোবার যে পরিক্ষায় অংক ভুল করেছি তার ইয়ত্ন নেই। সেই সাথে লজ্জিতও হতে হয়েছে অনেকবার। ক্লাসে, বাড়িতে বা বাহিরে দুই একটা ঘটনা তোমাদের বলি। শোনো তাহলে...

ক্লাস ফাইভে পড়ি তখন। বিজ্ঞান বইয়ের একটা প্রশ্ন ছিল রূপান্তরিত মূল ও কাণ্ডের কাজ। স্যার একদিন ক্লাসে এসে এই প্রশ্নের উত্তর লেখতে দিলেন। তাড়াছড়ো করা আমার স্বভাব। আগেই বলেছি। ভাবলাম সবার আগে লেখা জমা দেব আর স্যারের কাছ থেকে সাবাশি নেব। যেই ভাবা সেই কাজ। তাড়াছড়ো করে দ্রুত লিখে ফেললাম। হাতের লেখা কাকের ঠ্যাং বগের ঠ্যাং এর চাইতেও খারাপ হলো। কিন্তু হ'কেয়ারস? কলারটা উঁচিয়ে নিলাম। চুলের মাঝে হাত বুলিয়ে একটা স্টাইল করে নিলাম। এরপর স্যারের কাছে গিয়ে খুব জোরে বললাম — স্যার, শেষ (যেন সবাই শুনতে পায়) স্যার খাতা পড়ছেন। বাকিরা অবাক হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। আমি সেই ভাব নিছি। হাসানের দিকে তাকালাম। মুখ কালো হয়ে আছে ওর। মনে হলো ও হিংসায় জলেপুড়ে যাচ্ছে। আমাকে ও একবারেই দেখতে পারে না। সারাদিন খালি ফার্মের মুরগির মতো পড়ে আর বিমায়। খেলাধুলা কিছু করে না।

স্যার হ্যাঁ থেমে গেলেন। মোটা ফ্রেমের চশমাটা স্যারের নাকের ডগায় নেমে এসেছিল। স্যার চশমার কাঁচের ওপর দিয়ে আমার দিকে তাকালেন। ব্যাপার কী? চেহারা দেখে বোবা যাচ্ছে না স্যার কি ভাবছেন। বাড়ি আসবে নাকি প্রশংসার বৃষ্টি?

স্যার হ্যাঁ বাজখাঁই গলায় হাঁক দিলেন-হাসান, এদিকে আয়। হাসান প্রায় উড়ে আসল।

স্যারের মুখটা হাসিখুশি দেখাচ্ছে এখন। আমি ভাবলাম স্যার মনে হয় হাসানকে আমার খাতা দেখিয়ে বলবেন যে দেখ এভাবেই লিখতে হয় প্রশ্নের উত্তর। খুব গর্ব হচ্ছিল। হাসান ব্যাটাকে পাইছি আজকে। স্যার, হাসানকে বললেন- নে এই জায়গাটা জোরে জোরে পড়। হাসান বুঁবো নিল কোথায় পড়তে হবে। এরপর জোরে জোরে পড়ল- জুপান্তরিত মলের কাণ্ড!

স্যারসহ পুরো ক্লাস অটুহাসিতে ফেটে পড়ল। আমার কান লজ্জায় গরম হয়ে গেল। ফটা বেলুনের মতো চুপসে গেলাম। কোনোমতে বেঞ্চে ফেরত এসে মাথা নিচু করে থাকলাম বাকিটা দিন!

এরপর আর একটা ঘটনা বলি। এটা ক্লাস এইটে বা নাইনে থাকতে ঠিক খেয়াল নেই। চাচার বাসায় বেড়াতে গেছি। দুপুরে খাবার পর সবাই শুয়ে বসে অলস সময় কাটাচ্ছে। আমাকে চাচা সেদিনের হলুদ আলো পত্রিকা দিয়ে বললেন, পড়ে শোনা। চোখটা একটু বুজে আসছে।

আমি পড়তে শুরু করলাম। ঠিকই ধরেছ- একেবারে বুলেটের বেগে। সামনে বসে আছে পিচিছ ছেট ভাই। নিরীহ চেহারা দেখে মানুষ ধোঁকা খায়। ভাবে ছেলে খুব ভদ্র। কিন্তু খুব ডানপিটে। যাই হোক, জোরে জোরে পড়ার কারণে আমার মুখ থেকে মাঝে মাঝে থুতু বের হয়ে ওর মুখে পড়ছিল। আমি ইচ্ছা করেও এমন করলিলাম। ওকে শাস্তি দেবার জন্য। ও কিছু বলতে পারছে না। কারণ চাচাকে ও খুব ভয় পায়। একটা খবর পড়ে আর একটা খবরের শিরোনাম শুরু করেছি কেবল। সেই সময় সে পেয়ে গেল প্রতিশোধের সুযোগ।

আমি জোরে জোরে পড়লাম-

ম্যারাডোনা মা হলেন!

চাচা সঙ্গে সঙ্গে আধশোয়া থেকে স্টান উঠে
বসলেন। আমার দিকে এমন ভাবে তাকালেন
যেন- পাবনার বিশেষ হাসপাতালের বিশেষ
ডাক্তার এই মাত্র ভর্তি হওয়া নতুন রোগীর দিকে
তাকিয়ে আছে। আমি বুবলাম না ব্যাপার কী।
ওদিকে পিচ্ছি ছোটভাই হাসতে হাসতে বিছানায়
গড়াগড়ি খাচ্ছে। ওর হাসাহাসির শব্দ শুনে সুনি
আপা আর চাচীও পর্দার প্রিপাশ থেকে উঠি
দেবার চেষ্টা করছে। বহু কষ্টে ট্যাটন ছোটভাই
হাসি থামলা। এরপর বলল- তা ভাইয়া, তুমি
করে মা হবে?

আমি সঙ্গে সঙ্গে শিরোনামের দিকে তাকালাম।
দেখি সেখানে লেখা- ম্যারাডোনা মা হারালেন!!
এরপর বুবাতে পারলাম তাড়াভূঢ়ায় আমি কি
পড়েছি। লজ্জায় মাথা কাটা যাবার অবস্থা আমার!
শেষ একটা ঘটনা বলি। এটা এসএসসি পরীক্ষার
পর যে ছুটি থাকে সে সময়কার ঘটনা। মামার
বাসায় বেড়াতে যাচ্ছি। মামা বদলি হয়ে নতুন
একটা এলাকায় গেছেন। বাসার ঠিকানা
দিয়েছেন। কিন্তু আমি তাড়াভূঢ়া করতে গিয়ে
বাস থেকে ঐ ঠিকানার কিছু আগে অন্য একটা
জায়গায় নেমে গেছি। নামার পর বুবাতে পারলাম
ভুল হয়েছে। এমন সময় মামা ফোন দিলেন।

- কি ভাগ্যে কতোদূর?

আমি তো জায়গার নাম জানি না। রাস্তার পাশে
একটা দোকানের সাইনবোর্ডে দেখলাম জায়গার
নাম লেখা আছে। ওইটাতেই দ্রুত একবার চেখ
বুলিয়ে মামাকে বললাম

- মামা, আমি চৌপাছা আছি!

[১] ম্যারাডোনা একজন পুরুষ।

ঐ পাশ থেকে মামাতো ভাইদের খুক খুক করে
হাসির আওয়াজ পেলাম। মামাও হাসছেন।
বুবলাম ফোন লাউড স্পিকারে আছে। এবং
আরও বুবলাম কোথাও একটা বামেলা করেছি।
ভালো করে সাইনবোর্ডের দিকে তাকালাম।
দেখি সেখানে লেখা

চৌপাছা!!

লজ্জায় সাথে সাথে ফোন কেটে দিলাম।

এই তাড়াভূঢ়া করার অভ্যাস, অস্থিরতা একটু
বয়স বাড়লে ঠিক হয়ে যায়। আমারও আস্তে
আস্তে ঠিক হচ্ছে। কিন্তু এটার কারণে কতো
লজ্জা, অপমান, বাবা-মার পিটুনি, শাস্তি যে
খাওয়া লাগল! সেদিন একটা হাদীস পড়লাম।
রাসূল সান্নাহিত আলাইহি ওয়া সান্নাম আবুল
কাইস গোত্রের এক সাহাবিকে লক্ষ্য করে
বলেছিলেন:

**তোমার মাঝে দুটি গুণ আছে,
যা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল পছন্দ করেন:
১. সহনশীলতা, ২. ধীরস্থিরতা।** [২]

এসো আমরা নিজেকে বলি- আমরা তাড়াভূঢ়া
করব না। ধীরস্থির হব। বুঝেশুনে ঠাণ্ডা মাথায়
কাজ করব। তাহলে জীবন হবে পানির মতোই
সহজ।

আর একটা কথা...

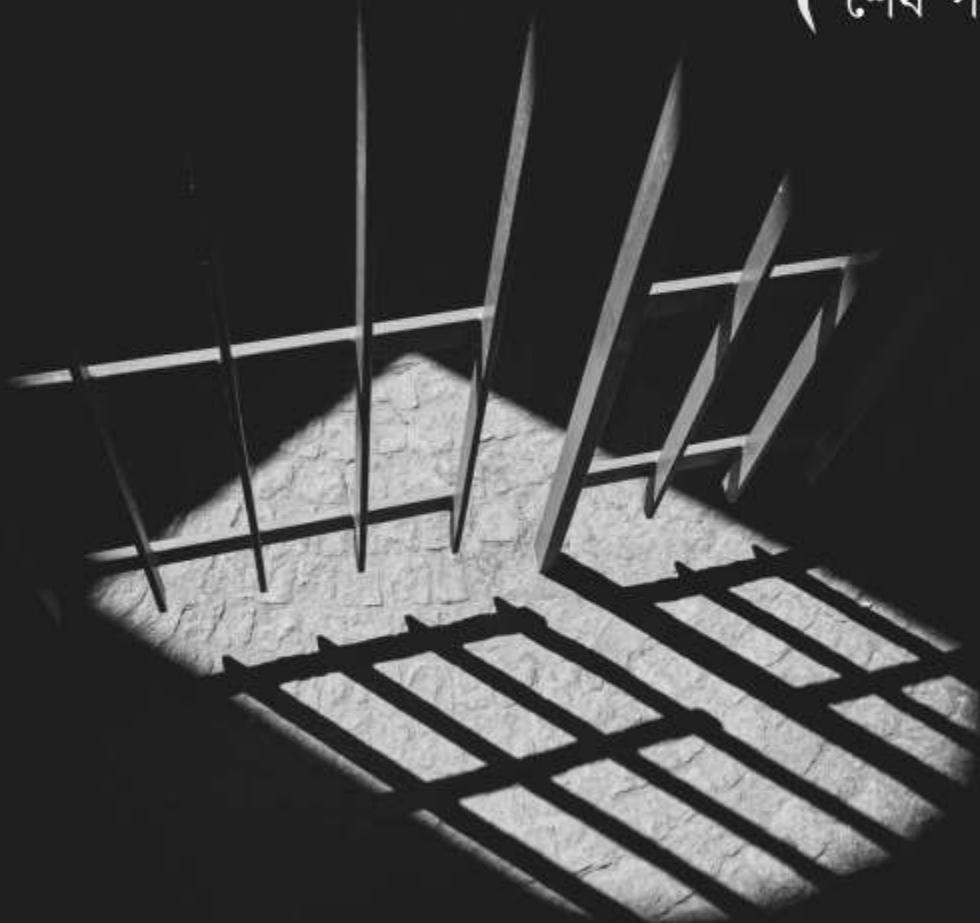
[বিঃ দ্রঃ আমাদের নিজস্ব গোয়েন্দা সূত্রে জানতে
পারলাম, তাড়াভূঢ়ায় দ্রুত লিখতে গিয়ে লেখক
কলমের নিব ভেঙ্গে ফেলেছে। তাই-আর একটা
কথা- আর জানা গেল না। - যোলো ভাইয়া]

[২] সহিহ মুসলিম ১৮, সহিহ ইবন হিবৰান ৪৫৪১

ফারহান মাহমুদ

জিম্মী!

শেষ পর্ব



এর পর...

১০.

“জয়নাল সাহেব, আপনার ছেলে এখন
আমাদের কাছে।”

“তাই নাকি! তোমরা কারা?”

“আমরা যারাই হই, সেটা গুরুত্বপূর্ণ নয়।”

“তো কী গুরুত্বপূর্ণ?”

“গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে আপনার ছেলে আমাদের
কাছে।”

“তোমাদের কাছ থেকে আমাদের কাছে আনতে
কী করতে হবে?”

“সাইকেলজির উপর গবেষণামূলক যে বইটি
আপনি লেখা শেষ করেছেন, তা প্রকাশ না
করে, আপনার কাছে কোন কপি না রেখে
আমাদেরকে দিয়ে দিতে হবো।”

“ওমা সে কী কথা! আমি তো ভাবলাম তোমরা
টাকা পয়সা চাইবো কত টাকা দরকার বলো?
আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি।”

“বেশী কথা বলবেন না যা বলা হইছে তাই।”

“কী বলছ? আমার কষ্টের গবেষণা আমি
তোমাদের দিয়ে দিব?”

“না দিলে আপনার ছেলে...”

“ফোন রাখো। চিন্তা ভাবনা করে দেখি।”

১১.

বেশ ভালো জায়গা। জেল খানার মতো করে
বানানো। মনে হচ্ছে এরা পেশাদার। কাজের
সুবিধার জন্য বানিয়ে নিয়েছো আমার সাথে
এদের আচরণ সন্তুষ্টজনক। সম্মানের সাথে কথা
বলছো। এদের উদ্দেশ্য স্পষ্ট নয়। সে ব্যাপারে
কিছু বলছেও না।

“কী করেন?”

“তুমি কে?”

“আমারে তো চিনবেন না। উন্নাদের লগে থাহি,
হ্যাগো কাম কাজে সাহায্য করিব।”

“বাহ, সুন্দর। আচ্ছা বলো তো আমাকে এখানে
কেন আনা হয়েছে?”

“আমি জানি। উন্নাদ আপনার আববার লগে
ফোনে কথা কইছো।”

“তা ভালো। কত টাকা চাওয়া হয়েছে?”

“টাকা চাওয়া হয়নি।”

“অবাক ব্যাপার, তাহলে?”

“আপনারে কমু না।”

“আচ্ছা আচ্ছা! না বলতে পারো। এখানে
গোপনীয়তার একটা বিষয় আছে, তাই না?”
“জানি না।”

“তোমার বয়স কত?”

“সতেরো।”

“গুমা”

দেখতে সহজ সরল লাগছে। একে কথার ফাঁদে ফেলে জানা যায় কেনো আমাকে আঁটকানো হয়েছে। এ ছেলে বলে দিবে নিশ্চিত। ঠেট পাতলা ধরণের ছেলে। কীভাবে বুবলাম? আমি মানুষ চিনি। একে ভুলিয়ে-ভালিয়ে এখান থেকে বের হওয়াও সন্তো। এখনো পর্যন্ত এখানের বেশ কিছু দূর্বলতা আমার কাছে প্রকাশ পেয়েছে। যেকোন ধরণের দূর্বলতা আমার কাজে লাগতে পারে। সারভাইভালে আছি। এখানে সববিছু খেয়াল রাখতে হয়। সবকিছু কে গুরুত্ব দিতে হয়। বেয়ার গ্রেইলস যেমন বলে থাকো।

ঝঝ.

“সম্মানিত পারিবারিক সদস্যবৃন্দ! আমি আপনাদের সামনে এই মুছুর্তে যা বলতে চাচ্ছি তা শোনার জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত হোন। বিষয়টি অত্যন্ত জটিল ও কঠিন। ঠাণ্ডা মাথায় শুনতে হবে। মাথা ঠাণ্ডা করে সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কাজ করতে হবে। খবর শোনার পর চিকার দেয়া যাবে না, লাফ দেয়া যাবে না, ভয় পাওয়া যাবে না, কান্না করা যাবে না। খবরটি হচ্ছে, শুভ এবং সুমার একমাত্র বড়ভাই, জনাব দিলরুবা বেগম এবং আমি জনাব জয়নাল হোসেন (বি.এ, এম.এ, এমফিল, পিএইচডি) এর একমাত্র বড় ছেলে জনাব অভ্রনীল এই মুছুর্তে অঙ্গাত এক জায়গায় দুর্ব্বলদের হাতে কিন্ডন্যাপের স্থীকার হয়েছে। তোমরা কি আমার কথা বুবাতে পারছো?”

“হায় আল্লাহ! কি বলছো তুমি এসব? সুমা, শুভ। তোদের বাবার কি মাথা খারাপ হয়ে গেলো না কি? অভ্রনীল কোথায় আছে? তুমি জানলে

কিভাবে?”

“উহু, পেরেশান হওয়া চলবে না। এ কাজটা সিদ্ধিক সাহেবেরা ব্যাটা আগেও একবার আমার লেখা চুরি করে নিজের নামে ছাপিয়েছে ঐ লেখার কারণে সে বর্ষসেরা লেখক এর পুরস্কার পেয়েছিলো, অথচ তা আমার পাওয়ার কথা।”

“আরে ধুর! কীসের লেখা আর সিদ্ধিক সাহেব, অভ্রনীল কোথায়?”

“সিদ্ধিক সাহেবের চ্যালারা নিয়ে থাকলে, তারা ওকে ভালো জায়গায় রাখবে এবং ক্ষতি করবে না। ওরা আমাকে ফোন দিয়েছিলা।”

“হ্যাঁ, তো কী বলল?”

শুভ, সুমা চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে আছে। এতক্ষণে মুখ খুললো-

“হ্যাঁ, বাবা কী বলেছে ওরা?”

“হ্যাঁ, ওরা যা বললো তা হলো, সাইকোলজির উপর আমার সদ্য লেখা শেষ করা বইটি ওদের দিয়ে দিতে হবে।”

“তো চলো বই নিয়ে কোথায় যেতে বলেছে?”

“আমি আমার বইটি দিয়ে দিবো?”

“অবশ্যই দিবো তা নয়তো কি ছেলের প্রাণ দিবে নাকি?”

“তোদের দু’জনের মন্তব্য কী?”

“মন্তব্য নিষ্পত্তিজন বাবা। বই দিয়ে দাও।”

জয়নাল সাতেব খালি চোখে উদাস ভঙ্গিতে
তাকিয়ে আছেন। অঙ্গুত পরিস্থিতিতে পড়েছেন
তিনি। বোবার চেষ্টা করছেন, অভ্যন্তরকে বেশী
ভালবাসেন না, নিজের লেখা বইকে। তিনি
অবাক হয়ে লক্ষ্য করলেন বইটি ওদের হাতে
হস্তান্তর করতে ইচ্ছা করছে না। আবার নিজেকে
মানসিকভাবে অসুস্থও ভাবছেন। ছেলের জীবন
বিপর্য, এই সময়ে কিসের বই আর টই?

১৩.

“আমার ক্ষুধা লেগেছে, তুমি আমাকে একটু
খাবার এনে দিতে পারবে?”

“হ পারবু”

“শোন, আমি টাকা দিয়ে দেই, তুমি দুই প্যাকেট
তেহারি এবং কোকাকোলা নিয়ে আসবো”

ছেলেটা তাকিয়ে আছে কিডন্যাপকৃত ব্যাক্তি টাকা দিয়ে তেহারি আনাছে, এমন পরিস্থিতিতে বোধহয় পড়েনি আগে

ছেলেটা তাকিয়ে আছে। কিডন্যাপকৃত ব্যাক্তি
টাকা দিয়ে তেহারি আনাচ্ছে, এমন পরিস্থিতিতে
বোধহয় পড়েনি আগে। আমি পকেট থেকে
টাকা দিলাম। নিয়ে চলে গেল। তেহারি আনবে
না মেরে দিবে? আমাকে আটকানের কারণ
জানতে পেরেছি এরা বাবাকে ফোন দিয়ে তার
নতুন লেখা বইটি চেয়েছে। একজনের কষ্ট করে
লেখা বই আরেকজনের নামে চালিয়ে দিবো
নেতৃত্বকার চূড়ান্ত পর্যায়ের অবনতি। বইটা
তাদের হস্তগত হতে দেয়া যাবে না।

“এই নেন!”

“নিয়ে আসছো? গুড়া তেহারি দুইটা কেন
জানো? একটা তোমার জন্য। দুইটি প্লেট এবং
দুইটি প্লাস নিয়ে আসো”

মুখ দেখে বুঝলাম ও অবাক হয়েছে। আমার
পকেটে বেশ অনেকগুলো স্লিপিং ট্যাবলেট
আছে। আসলে আমার একটা মেয়ের সাথে প্রেম
ছিল গতো কর্যক্রম যাবত। পড়াশোনা, বাবা-
মা সব কিছু ভুলে ওর জন্য পাগল হয়ে ছিলাম।
বাবার কাছ থেকে জোর করে টাকা নিয়ে
ইচ্ছামতো উড়িয়েছি। গতোকাল বিকেলে দেখি
সে আমাদের ক্লাসেরই এক ছেলের সাথে বসে
ফুচকা খাচ্ছে। ঐ ছেলের মুখে ফুচকা তুলে
দিচ্ছে। দূর থেকে দেখেই যা বোবার বুরো
গেলাম আমি। কষ্টে আমার বুকটা ফেঁটে যাচ্ছিল।
এরজন্য আমি সবকিছু ছাড়লাম আর সেই এমন
করল আমার সাথে। সেই মুহূর্তে একটা সিদ্ধান্ত
নিয়ে ফেললাম। আমি আর থাকব না পৃথিবীতে।
বাসায় ফিরে গেলাম। বাবার স্টাডিকুলে
অনেকগুলো ঘুমের ট্যাবলেট আছে জানতাম।
ওগুলো সংগ্রহ করে বেরিয়ে পড়লাম বাসা
ছেড়ে। রাত হলে, আকাশে চাঁদ উঠলে ট্যাবলেট
গুলো একসাথে খেয়ে আত্মহত্যা করব। এই
ছিল আমার প্ল্যান। কিন্তু এখন এই বিপদে পড়ে
বুরাতে পারছি আমি কী ভুল করতে যাচ্ছিলাম।
আত্মহত্যা করা কোনো সমাধান নয়, এটা
কাপুরুষদের কাজ। এই বিপদে না পড়লে বুবাতে
পারতাম না আসলে বেঁচে থাকা, বাইরের আলো
বাতাস, স্বাধীনতা কতো আনন্দের! বাবা মা
ভাই বোন... একজন মানুষের কতো আপনজন!

ঐ ট্যাবলেটগুলো এখন কোকাকোলায় দিলেই
গলে যাব!

১৫.

“জয়নাল সাহেব, কী সিদ্ধান্ত নিলেন?”

“কী সিদ্ধান্ত আর নিব? কোথায় আসতে হবে বলো।”

“সোজা চট্টগ্রাম এসে এই নাস্তারে যোগাযোগ করবেনা বাই”

“আচ্ছা..হ্যালো... হ্যালো....”

“অভ্যন্তীল!”

তবয়ে দৌড় দিতেই পিছনে দেখলাম বাবা দাঢ়িয়ে।

“বাবা, তুমি এখানে? বই নিয়ে এসেছো নিশ্চয়?”

“হ্যাঁ বই তো নিয়ে আসছি বুবাতে পারছিনা কিছু, তোকে নাকি কিডন্যাপ করা হয়েছে? তুই এখানে কেন?”

“গাড়ী নিয়ে এসেছো?”

“হ্যা, গাড়ীতে সবাই আছো কিষ্ট..”

“কিষ্ট ফিষ্ট রাখো। গাড়ী কোথায়? দ্রুত গাড়ী ঘুরাতে বলো।”

জ্যোৎস্না রাত যাকে বলা হয় ‘চারিপসর রাইত’। তাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের বুক চিরে সাঁই সাঁই করে মাইক্রোবাসটি ছুটছে তাকার উদ্দেশ্যে। বুকের মধ্যে অন্যরকম এক ভালো লাগা কাজ করছে। অন্যরকম মুক্তির স্বাদ পাচ্ছি আমি। কিডন্যাপারদের কবল থেকেই শুধু আমি মুক্ত পাইনি। আমি মুক্তি পেয়েছি প্রেমের কারাগার থেকেও, যেখানে জিম্মী ছিলাম গতো কয়েকটা বছর।

[স্লিপ]

বের হতেই রিকশা পেলাম। রিকশা নামিয়ে দিলো বাসস্ট্যান্ডে। এখানে এসে বুঝলাম এরা আমাকে খুলনা থেকে চিটাগং নিয়ে এসেছো অ্যাডভেঞ্চারের জন্য এসেছিলাম। এর চেয়ে ভালো অ্যাডভেঞ্চার হয় নাকি?



মাসজিদ কথন

-লষ্ট মডেল

শরতের শেষ বিকেল। নদীর ধারে বসে বসে
বাতাস খাচ্ছি। একটু আনমনা হয়ে গিয়েছিলাম।
—কী অবস্থা? কেমন আছো?

ডাক শুনে পাশ ফিরলাম। দেখি শামীমের
আবরু। কোলে একটা পিচ্চি। ৭/৮ মাসের মতো
হবে মনে হয়।

শামীম হলো আমাদের ২ বাড়ির পরের বাড়ির
ছেলে। আমার চাইতে ৪/৫ বছরের ছোট হবে।
কুশল বিনিময় শেষে জানতে চাইলাম- পিচ্চিটা
কে, কাকু?

—এটা শামীমের ছেলে। হাসিহাসি মুখে জানালো
শামীমের আবরু।

আমার মুখটা ও হাসিখুশি হয়ে গেল।

বাহ! এতো অল্প বয়সেই শামীম বাচ্চার বাপ হয়ে
গেল। পিচিকে কোলে নিলাম। এবং কোলে
এসেই পিচ্চিটা প্রথম যে কাজ করল তা হলো
আমার দাঁড়ি ধরে হ্যাঁচকা টান মারা। অস্ফুট
একটা আর্তনাদ বের হলো আমার মুখ থেকে।
ভয় পেয়ে গেল পিচ্চি। ট্যাঁ ট্যাঁ করে চিৎকার
করে কাঁদিতে লাগল। সেই সাথে সজোরে নিজের
কল ছেড়ে দিল। দুই-তিন সেকেন্ডের মধ্যেই
যা ঘটার ঘটে গেল। আমি একেবারে ভ্যাবাচ্যাকা
খেয়ে গেলাম।

শামীমের আবরু কিছুটা দূরে দাঁড়িয়ে আছে।
মজা পেয়েছে মনে হয়। এগিয়ে এসে আমাকে
মহাবিপদ থেকে উদ্ধার করল। হাঁফ ছেড়ে
বাঁচলাম। শামীমের পিচ্চির চেহারা অনেকটাই
শামীমের মতো। শামীমের ছেলেবেলার কিছু
উরাধুরা স্মৃতি মনে পড়ে গেল। স্মৃতিগুলো যে
কেমন তা তোমরা শুনলেই বুবাতে পারবে।

শামীমের ছোটবেলার চেহারা ও পোশাক-
পরিচ্ছদের বর্ণনা আগে দিয়ে নেই। তাহলে
তোমরা বুবাতে পারবে যে ওর দ্বারা আসলে কী
কী করা সম্ভব!

ছেটবেলার কথা মনে পড়লেই প্রথমে যে চেহারা
ভাসে তা হলো ও একটা কালো রঙের হাফপ্যান্ট
পরে আছে। হাফপ্যান্টের পোস্ট অফিস অবশ্য
খোলা। আর নাক দিয়ে সর্দি ঝুলে আছে। একটু
পর পর সে সুড়ৎ করে ভেতরে টেনে নিচ্ছে।
মাঝে মাঝে খেয়াল থাকে না ওর অবশ্য। সর্দি
বিপজ্জনকভাবে ঝুলে থাকে অনেকক্ষণ। কেউ
মনে করিয়ে দিলে সে সেটা ভেতরে টেনে
নেয়। [তবে আমি চুপে চুপে একটা কথা বলি
তোমাদের। শামীম যেন না জানে। আমি নিজের
চোখে দেখেছি দুই-তিনবার সর্দি তাঁর নিজের
মুখে ঢুকে গিয়েছে। সে জিহ্বা বের করে চাটছে।]

শামীম কে নিয়ে আমরা ম্যাজিক দেখাতাম
এলাকায় নতুন কেউ বেড়াতে আসলে। ও ছিল
ধ্বনি ধূলোয় এতোই গড়াগড়ি
করত আর রোদে এতোই ঘূরত যে তোমরা
দেখলে ভাববে এ বোধহয় এখনই আফ্রিকার
বিমান থেকে নেমেছে। আমরা গোসল করতাম
বিশাল একটা দিঘীতে। এলাকায় নতুন কোনো
পিচি আসলে গোসল করার সময় ওকে
বলতাম- দেখ, তোকে একটা ম্যাজিক দেখাই।
এই যে দেখছিস, শামীম, কালো কুচকুচো
ওকে আমরা একটা দুআ পড়ে ফুঁ দিব আর সে
ফর্সা হয়ে যাবে। এরপর সবাই মিলে শামীমের
গা কচলানো শুরু করতাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই
মহলা সরে গিয়ে ওর গায়ের আসল রঙ বের
হয়ে যেত। আর আমরা ম্যাজিক দেখানোর সেই
ভাব নিতাম।

শামীমের ব্যাপারে পাড়ায় সবচেয়ে প্রচলিত যে
কথা ছিল তা হচ্ছে সে **এই ৫/৬ বছর বয়সেই**
একটা পেয়ারার বাগান করে ফেলেছে।
হেগে হেগে! অবাক হইওনা। তুমি ঠিকই
পড়েছ। খুলেই বলি তাহলে।

আমাদের বাসায় ছিল দেশী পেয়ারার বিশাল
একটা গাছ। সারারাত ধরে পাকা পেয়ারা খসে

খসে পড়ত আমাদের উঠানে। ঘুম থেকে উঠে
শামীমের প্রথম কাজ ছিল চোখ মুছতে মুছতে
আমাদের বাসায় আসা। কখনও এমন হয়েছে
যে সে একেবারে বিছানা থেকে উদোম গায়ে
এসে হাজির। আমার দাদি শামীমকে বেশ মেহে
করত। দাদি পাকা পাকা পেয়ারাণ্ডলো তার জন্য
রেখে দিত। সে বারান্দায় বসে বসে খেত যতক্ষণ
পারে। এরপর গিয়ে হাজির হতো আমাদের
বাড়ির পেছনের একটা পরিত্যক্ত মাঠে। সেখানে
বসে বসে প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিত। একেকদিন
এক এক স্থানে। এরপর বর্ষাকাল আসলো।

ওর ঐ বিশেষ জিনিসগুলোর সাথে পেয়ারার
বিচি মাটিতে মিশে গিয়েছিল। বর্ষার বৃষ্টিতে এই
বিচিগুলো থেকে গাছ বের হলো। ঐ এলাকা
ছেয়ে গেল পেয়ারার গাছে। পুরো বাগান হয়ে
গেল। উঙ্গ, একটুও বাড়িয়ে বলছি না। ঐ
গাছগুলো বেশ কয়েকমাস ছিল। এরপর একটা
গুরু তুকে একদিন সবগুলো গাছ সাবাড় করে
দেয়।

আশা করি শামীমের যে লম্বা পরিচয় দিলাম
তাতেই তোমরা বুঝতে পারছ সে কেমন উন্নত
ছিল। তবে তার তেলেসমাতি মাসজিদে
নামাজ পড়তে গেলে অন্য মাত্রায় পৌঁছে
যেত। এত ঘটনা যে মনে পড়ছে! কোনটা ছেড়ে
কোনটা বলি। দাঁড়াও আগে কিছুক্ষণ হেসে নেই।
২০/২২ বছর আগের ঘটনা। সে সময় ছোট
বাচ্চাদের [বিশেষ করে মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিভিন্নদের] ফুল
প্যান্ট কালেভদ্রে কিনে দেওয়া হতো।
নামাজ পড়তে বা সকালে মন্তব্যে যাওয়ার জন্য
চক্রাবক্রা লাল-নীল বিভিন্ন লুঙ্গিই ছিল সঙ্গী।
শামীম এমনই লুঙ্গিই পরে নামাযে আসত। ওর
বাসা মাসজিদের কাছেই ছিল। একা একাই যেত।
একবার গরমের ছাঁটিতে অনেক দিন মামার
বাসায় ছিলাম। শামীমের সাথে দেখা সাক্ষাৎ
হয়নি। বাসাতে পৌঁছাতে পৌঁছাতে দুপুর হয়ে

গেল। শুক্রবার ছিল। তড়িঘড়ি করে মাসজিদে
গেলাম।

মাসজিদে সাধারণত বড়রা যেটা করেন তা
হলো সকল পিচিদের স্ক্যান করে পিছনের
কাতারে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। তো এমন স্ক্যানিং
এর চক্কে পড়ে আমি হাজির হলাম একেবারে
শেষ কাতারে। বামপাশের কোণায়। সেখানেই
শামীমের সাথে দেখা। নামায ইতোমধ্যে শুরু
হয়ে গেছে। সে আমাকে দেখেই মহাখুশি।
চিৎকার দিল- আরে ভাইয়া!! তুমি কখন এলো?
আমি কোনোমতে তাকে শাস্ত করে নামাজ শুরু
করলাম।

সে উশখুশ করতে করতে নামাযের হাত বাঁধলো।
কিন্তু সে নামাজে মন বসাতে পারছে না। আমি
এতদিন কোথায় ছিলাম, কী করলাম, দুপুরে
আজকে কোন বাংলা ছবি হবে এসব প্রশ্ন জানার
জন্য উদ্গীব হয়ে রইল। সে এদিক ওদিক দুলছে।
ওর ঐ পাশের পিচিটা তার এই দোলাদুলিতে
মজা পাচ্ছে। ওর গায়ে ধাক্কা লাগছে। আবার
সেও শামীমকে ধাক্কা দিচ্ছে হালকা করে হাসির
হিড়িক উঠেই আবার মিলিয়ে যাচ্ছে। পেটের
ভেতর থেকে আমারও হাসির বুদবুদ উঠছে।
বছকষ্টে হাসি চাপিয়ে রেখে নামাযে মন দিতে
চেষ্টা করলাম। কিন্তু ধাক্কাধাক্কি চলছেই।

তো এভাবে ধাক্কাধাক্কির এক পর্যায়ে **শামীমের
লুঙ্গি খুলে আশ্রয় নিল সোজা মেরোতে!**
পাশের পিচিটা হো হো করে হেসে উঠল।
কয়েকজন পিচি কাতার ছেড়ে বেরিয়ে গিয়ে
হাসাহাসি শুরু করল। আমি বছ কষ্টেও হাসি
থামাতে পারলাম না। সালাম ফেরানোর পরেই
দুরবুর করে সবাই বাহিরে দৌড় দিলাম। পেছন
থেকে বড়দের হয়কি ধামকি ভেসে আসছে।

এই লুঙ্গি নিয়েই আর একটা ঘটনা। জুমার
ফরজ নামায শেষে মাসজিদের বারান্দায় সুন্নত
পরে বসে আছি। শামীম আমার পাশে এসে

নামাযে দাঁড়িয়েছে [নামাযে দাঁড়ানো মানে আর কি... এদিক সেদিক তাকাবে, চোখাচোখি হলে হাসবে, তারপর যখন মনে হবে যে না অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকা হলো আর না, তখন টকাস করে একটা সিজদাহ দিবে]। মাসজিদের মাঠে কিছু রাজহাঁস চড়ে বেড়াচ্ছে। আর ডাকাডাকি করছে। আমাকে মাসজিদের খাদেম বলল- যাও তো কাকু, হাসগুলো তাড়িয়ে দাও। মুসলিমদের সমস্যা হচ্ছে।

আমি বারান্দার রেলিং টপকে হাঁস তাড়াতে গেলাম। শারীর আমাকে দেখে নামায ফেলে দৌড় দিল। সেও হাঁস তাড়াবে। সেও আমার মতো বারান্দার রেলিং টপকে আসার জন্য লাফ দিল। লাফটা ঠিক যুতসই হলো না (ছোট মানুষ আর কতো জোরে লাফ দিতে পারবে!) মাঝপথে রেলিং এর সাথে ওর লুঙ্গি জড়িয়ে গেল। দু সেকেন্ড সে রেলিংয়ের সাথে আটকে থাকল। এরপর দেখা গেল – তার লুঙ্গি রেলিং এ আটকে আছে। বাতাসে উড়েছে। আর সে বারান্দায় শুয়ে আছে। ব্যথায় কান্না শুরু করে দিয়েছে!

শবে কদরের^[১] রাতে আমরা দলবেঁধে মাসজিদে যেতাম নামায পড়তো। নামায পড়া আর কিসের কি এর চাইতে বেশি হতো ভূতের গল্লের আসর, পুরো এলাকায় ঘোরাঘুরি করা বা দুই-চার রাকাত নামায পড়েই মাসজিদের মেঝেতে ঘুমিয়ে যাওয়া। সেহেরীর সময় মাসজিদে হাঁসের মাংশের খিচুরী দিত। সেটাও ছিল অন্যতম আকর্ষণ। তো একবার শবে কদরের রাতে দেখি আমার পাশ থেকে হিসুর গন্ধ আসছে। ব্যাপার কী! পরে দেখি যে শারীর ঐখানে ঘুমিয়ে আছে আর সে সুন্দর মতো ঘুমের ঘোরে হিসু করে দিয়েছে!! গন্ধে গন্ধে খাদেম এসে হাজির। তারপরের ঘটনা আর নাই'বা বলি।

এতসব কাণ্ডকারখানার পরেও শারীর মাসজিদে মাঝে মাঝেই নামাযে যেত। শুক্রবার ছাড়াও। তবে এবার ওর মাসজিদ ছাড়ার ঘটনাটা বলি। হেঁগে হেঁগে পেয়ারার বাগান বানানোর পরের বছরের ঘটনা। গ্রীষ্মকাল চলছে। যুহরের ওয়াক্ত। প্রচণ্ড গরম মাসজিদে। শারীর যথারীতি লুঙ্গি পরে হাজির মাসজিদে। খাদেমের সাথে ওর ভালোই সুসম্পর্ক (!) ছিল আগেই বলেছি। ও মাসজিদে তুকতেই খাদেম কি জানি বলল ওকে। ওর চেহারাটা কালো হয়ে গেল দেখলাম। মাসজিদের বারান্দায় আমি বসে ছিলাম। আমার সাথে দুই একটা কথা বলে সে মাসজিদের ভেতরে চলে গেল। একটু পর মাসজিদের ভেতর থেকে বেশ হইচাই শোনা গেল। গিয়ে দেখি সবাই মিলে শারীরকে ধর্মকাছে। কাহিনী হলো- খাদেম সুন্নত নামায পড়ছিল। খাদেম যেই সিজদাহ দিতে গিয়েছে, শারীর সঙ্গে সঙ্গে তার পশ্চাতদেশে চাটি মেরেছে!

ইমাম সাহেব শারীরকে সে যাত্রায় বাঁচালেন। ছোট মানুষ, ভুল করে ফেলেছে। কিছুক্ষণ পরে জামাআত শুরু হলো। আমি একেবারেই কাতারের বামপাশে। আর আমার পাশে শারীর। নামায শুরু হতেই সে নামায ছেড়ে দিয়ে কোথায় যেন চলে গেল। এরপর মাসজিদের বিভিন্নস্থান থেকে ধূপধাপ আওয়াজ ভেসে আসল। এবং এর একটু পরেই মাসজিদের সব ফ্যান বন্ধ হয়ে গেল। লাইট ঠিকই ছলছিল। কিন্তু ফ্যান বন্ধ। গরমে ঘেমে একেবারে গোসল করার মতো অবস্থা আমাদের। অনেক কঠে নামায শেষ হলো। এরপর ফ্যান বন্ধ হবার আসল কারণ জানা গেল। সবাই শারীরকে ধর্মকাধারকি করায় সে রাগ করে সবগুলো ফ্যান বন্ধ করে দিয়ে চলে গেছে। যাবার আগে মাসজিদের ছোট ছোট টাকা সংথতের

[১] সন্তান্য রাত

বাক্সগুলোতে বালি ভরে দিয়েছে।^[৪]
এরপর শামীকে আর তেমন মাসজিদে দেখিনি।
বড় হবার পরেও ওকে কালেভদ্রে মাসজিদে
দেখা যায়। এমন শামীম হয়ত আমাদের দেশের
প্রতিটি পাড়ায় মহল্লায় আছে।

দুই.

আমাদের দেশের মাসজিদগুলোতে সাধারণত
বাচ্চাদের স্বাগতম জানানো হয় না। বাচ্চারা
মাসজিদে নামায পড়তে গেলেই মুসলিমদের
সালাত নষ্ট হবে, চিংকার-চেঁচামেচি করে
পরিবেশ নষ্ট করবে এমন ধারণা করা হয়।
অনেক বাচ্চাই আসলে মাসজিদে গেলে দুষ্টুমি
করে। তাদের এই বয়সটাই চৰ্খলতার, দুষ্টুমি
করার, মাঠে-ঘাটে ছোটাচুটি করার।

মাসজিদে শিশুদের সালাতে নিয়ে আসার ক্ষেত্রে
ইসলাম কী বলে?
নামায ইসলামের খুবই গুরুত্বপূর্ণ ইবাদাত।
হাশরের ময়দানে নামাযের হিসাব নেওয়া হবে
সবার আগে। তাই সন্তানদের নামায করে
তোলার জন্য মুহাম্মাদ ﷺ সুস্পষ্ট নির্দেশ
দিয়েছেন। তিনি ﷺ বলেন,
'সাত বছর বয়স হলে শিশুকে সালাতের
আদেশ দাও, দশ বছর হলে চাপ সৃষ্টি
করবে, প্রয়োজনে মৃদু প্রহার করবে'।^[৫]

বাচ্চাদের নামায বানানোর একটি গুরুত্বপূর্ণ
আমল হতে পারে মাসজিদে নিয়ে যাওয়া।
কাতাদা রা. বলেন, 'মাসজিদে বসে আমরা
নামাযের অপেক্ষা করছিলাম। রাসূলে
কারীম ﷺ তখন আপন নাতি উমামা
বিনতে যাইনার রা.-কে নিয়ে আসেন।
তিনি নবি ﷺ এর কোলে ছিলেন। তাঁকে

[২] সত্য ঘটনা অবলম্বনে, ঈষৎ পরিমার্জিত ও আশ্রয়
নেওয়া হয়েছে

[৩] সুনানে আবী দাউদ ৪৯৬, মুসামাফে ইবনে আবী শাইবা
৩৫০১, মুসানাদে আহমাদ ৬৬৮৯

কাঁধে নিয়েই তিনি নামাযের ইমামতি
করেন। রুকুতে যাওয়ার সময় তাঁকে
জমিনে রেখে দিতেন। সিজাহ থেকে
উঠে তাঁকে আবার কাঁধে নিয়ে নিতেন।^[৬]

আমরা শিশুদেরকে মাসজিদে নিয়ে আসতে
নিয়েধ করছি, বাধা প্রদান করছি। কিন্তু রাসূল
ﷺ শিশুকে মাসজিদে নিয়ে এসে, তাও আবার
মেয়ে শিশুকে, একেবারে কাঁধে নিয়ে নামাজ
আদায় করছেন।

এবার একটু ভিন্ন হাদিস উল্লেখ করছি। আবু
হুরাইরা রা. বলেন, 'রাসূল ﷺ মাসজিদে
নববিতে নামাযের ইমামতি করছিলেন।
একজন শিশুর কানার আওয়াজ শুনতে
পেয়ে তিনি সংক্ষিপ্ত সুরা দিয়ে নামায শেষ
করে দেন'।^[৭]

অন্য একটি হাদিসে উল্লেখ আছে, আয়িশা
রা. বলেন, 'কোনো একদিন ইশার নামায
পড়াতে আসতে নবি ﷺ একটু দেরি
করেন। ফলে মাসজিদে উপস্থিত শিশুরা
ঘুমিয়ে পড়ে।'^[৮]

এই হাদিসগুলো থেকেই স্পষ্ট বোঝা
যাচ্ছে মুহাম্মাদ ﷺ-এর মাসজিদে শিশুদের
প্রবেশাধিকার ছিল।

বাবা-মার দায়িত্ব

বাবা-মার দায়িত্ব হলো সন্তানদেরকে ভালো
মতো নাসীহাত দেওয়া। মাসজিদের আদব
শিখিয়ে দেওয়া। নামাযের নিয়ম-কানুন
শেখানো। মাসজিদে গিয়ে চিংকার-চেঁচামেচি
করা যাবে না, নামায ছেড়ে এদিক সেদিক
যাওয়া যাবে না, কেউ নামায পড়লে তার সামনে
দিয়ে যাওয়া যাবে না, নামায চলাকালীন এদিক

[৪] সহিহ বুখারী: ৫১৬, সহিহ মুসলিম ৫৪৩

[৫] মুসনাদে আহমাদ: ৯৫৮১

[৬] সহিহ বুখারী: ৫৬৬, সহিহ মুসলিম ৬৩৮

ওদিক তাকানো যাবে না, হিসু করে দেওয়া যাবে না... ইত্যাদি। যদি নিশ্চিত হন যে সে চিৎকার-চেঁচামেচি করবে না কিন্তু হিসু করে দিতে পারে তাহলে ডায়াপার পরিয়ে নিয়ে যান। কাতারের একটা সাইডে দাঁড়ানেন। তবে যদি একেবারেই অবুবা বাচ্চা হয় তাহলে মাসজিদে না নিয়ে যাওয়াই উত্তম।

আর একটি কথা, যদি মাসজিদে গিয়ে আপনার শাস্তিশিষ্ট বাবু হঠাত অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি সৃষ্টি করে এবং মুসলিমদের বকাবকা সহ্য করতে হয় তাহলে বাসায় এসে বাবুকে বকাবকা করবেন না। এতে তার মেধাবিকাশ বাধাপ্রাপ্ত হবে। মাসজিদের প্রতি তার একটা ভীতি তৈরি হবে। সে বড় হলেও মাসজিদে যেতে চাইবে না।

তোমাদের দায়িত্ব

তোমরা মনে হয় না এই বয়সে এসে আর দুষ্টামি করো। কেউ করে থাকলে এখন থেকেই বাদ দিয়ে দাও। মাসজিদে বসে বসে ফ্রিফ্যার, পাবজি খেলবে না। মাসজিদের পবিত্রতা নষ্ট হয়ে যাবে ভাই। পাশাপাশি তোমাদের আরও অনেক অনেক দায়িত্ব রয়েছে। সেগুলো হচ্ছে-

১। তোমরা আর কিছু সময়ের মধ্যে পূর্ণবয়স্ক মানুষ হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ্। সমাজ তোমাদের মতামতকে গুরুত্ব দেওয়া শুরু করবে। তোমরাই আস্তে আস্তে মাসজিদের দায়িত্বগুলো বুঝে নিবো। সে সময় মাসজিদের মেহমান শিশুদের প্রতি তোমাদের আচরণ কেমন হওয়া উচিত সেটা জেনে রাখ।

২। তোমাদের অভিভাবকদের মাধ্যমে ইমাম সাহেব বা মাসজিদ কমিটির কাছে যেতে পারো। বড়দের মাধ্যমে সুন্দর করে বিষয়গুলো আলোচনা করতে পারো।

৩। মাসজিদে কোনো বাবুকে বকাবকা করতে দেখলে তাকে আগলিয়ে রাখার চেষ্টা করবে। বড়দের সাথে আবার বেয়াদবি করে বসো না।

আংকেল, ছোট বাচ্চা বোঝে নাই, মাফ করে দেন। সামনে থেকে আর এমন করবে না...। বকা খাওয়া বাবুকে বাহিরে নিয়ে গিয়ে চকলেট কিনে দিতে পারো। বা মাথায় হাত বুলিয়ে একটু আদর করলেও সে খুশি হয়ে যাবে।

৪। মাসজিদে আসা বাচ্চাদের একত্রিত করে সুন্দর করে তাদের মাসজিদের আদরগুলো বুঝিয়ে দিতে পারো। আমি এটা দেখেছি বেশি ধর্মকাধার্মিক করলেই বাচ্চারা বেশি দুষ্টামি করে। একটু সুন্দর করে বোঝালেই ওরা বুঝে। এছাড়া বন্ধুরা সবাই মিলে পিচিদের কাতারের মাঝে মাঝে নিয়ে দাঁড়াবে। ওদের একসাথে একই কাতারে দাঁড় করিয়ে দিবে না। এতে বেশি দুষ্টামি করো।

৫। তাদের সাথে সুসম্পর্ক গড়ে তোলো। গল্প করো। বন্ধুরা সবাই মিলে চাঁদা তুলে ওদের মাঝে মাঝে চকলেট বা চিপস কিনে দিলে। ওদের সাথে একটু খেলাধুলা করলে মাসজিদের বাহিরের মাঝে বা অন্য কোথাও। ওদের মাসজিদে আসাকে আনন্দময় করে তোলার চেষ্টা করলো। মনে রাখবে ভাই, তোমার এই সামান্য প্রচেষ্টাটুকু হতে পারে তোমার জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ বিনিয়োগের মধ্যে একটি।

মুহাম্মদ ﷺ এর মাসজিদ, মাসজিদে নবাবি বা অন্যান্য দেশের মাসজিদগুলোতে বাচ্চারা মাসজিদে এসে অত্যন্ত আনন্দময় অভিজ্ঞতা লাভ করে। পরবর্তী নামাযি প্রজন্ম গড়ে তোলার জন্য এটা আসলে অনেক দরকারী। ছোট বয়সেই মাসজিদ সম্পর্কে ভীতি বা বিকল্প ধারণা তৈরি হলে পরবর্তীতে তা দ্রু করা আসলে অনেক কঠিন হয়ে যায়। আবার বিপরীতটাও সত্য। শিশুকালে মাসজিদের সাথে সুসম্পর্ক গড়ে উঠলে পথ ভোলার সন্তাবনা করে আসে অনেক। একটা প্রবাদের মতো কথা আছে। যদি মাসজিদের পেছনের কাতার থেকে বাচ্চাদের

হাসাহসির শব্দ না পাওয়া যায় তবে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য চিঠ্ঠিত হ্বার সময় চলে এসেছে।

মাসজিদ কমিটি ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মধ্যে নামাযির সংখ্যা বাড়ানোর জন্য কিছু পদক্ষেপ নিতে পারে চাইলেই-

১। একদিন এলাকার সব পিচিদের একত্রিত করে মাসজিদের নিয়ম-কানুনগুলো শিখিয়ে দেওয়া। সাথে নামাযের নিয়ম কানুনও। তাদের দুষ্টুমি অনেক করে যাবে ইনশাআল্লাহ।

২। সবাইকে একদম পেছনের কাতারে দাঁড় না করিয়ে বড়দের কাতারের মাঝে মাঝে দাঁড় করানো।

৩। মাসজিদে শিশুদের উপস্থিতিতে মুসলিমদের দায়িত্ব-কর্তব্যসমূহ খুতবায় বুবিয়ে দেওয়া।

৪। বাচ্চারা একটু দুষ্টুমি করতেই পারে এতকিছুর পরেও। তাদেরকে বকাবকা না করা। বকাবকা করলে তারা আর মাসজিদে আসবে না। এছাড়া মাসজিদে এভাবে চিংকার-চেঁচামেচি করে বাচ্চাদের বকাবকি করলে অন্য মুসলিমদেরও নামাযে সমস্যা হয়। এর চেয়ে বরং বাচ্চাদের অভিভাবককে ডেকে সুন্দর করে বুবিয়ে দিন। সন্তানের সামনেই অভিভাবকদের অপমান করবেন না। আমাদের নিজেদেরও অনেক সময় ভুল হয়ে যায়। মোবাইলের রিংটোন বেজে উঠে। উচ্চস্বরে কথা বলে উঠি।

পরবর্তী প্রজন্মকে নামাযি বানানোর গুরুত্বায়িত আমাদের ঘাড়েই। কাজেই এই ব্যাপারটিকে গুরুত্ব দিয়ে দেখা উচিত। মাথাব্যথা করলে আমরা মাথা কেটে ফেলি না। কিছু বাবু দুষ্টুমি করে বলে সকল বাবুর জন্য মাসজিদে প্রবেশ নিয়ে করে দিলাম বা এমন পরিবেশ সৃষ্টি করলাম যে, কোনো বাবুই আর মাসজিদে আসতে সাহস পাচ্ছে না, তাহলে সেটা মুহাম্মাদ

ﷺ কে অনুসরণ করা হবে না। তাঁর বিরোধিতা করা হবে।

আলহামদুলিল্লাহ, বাংলাদেশের অনেক মাসজিদেই বাচ্চাদের মাসজিদমুখী করার জন্য সুন্দর সুন্দর প্রোগ্রাম শুরু হয়েছে।
যেমন-

১। ৪০ দিন জামাআতে টানা নামাজ পড়লে সাইকেল, ফুটবল, ক্রিকেট ব্যাট ... ইত্যাদি বিভিন্ন উপহার দেওয়া।

২। মাসজিদে নামায পড়তে গেলেই চকোলেট উপহার দেওয়া।

৩। মাসজিদকেন্দ্রিক পাঠ্যাগার, খেলাধুলা, বনভোজন ইত্যাদির আয়োজন করা।

এসমস্ত উদ্যোগ অত্যন্ত আনন্দের জন্ম দেয়। ভবিষ্যৎ প্রজন্ম সম্পর্কে আমাদের আশাবাদী করে তোলে। আমরা আন্তরিকভাবেই দুআ করি শিশুদের মাসজিদমুখী করার এই আয়োজনগুলো আল্লাহর তাআলা কবুল করে নিন। এমন উদ্যোগ ছাড়িয়ে পড়ুক বাংলাদেশের প্রতিটি মাসজিদে।

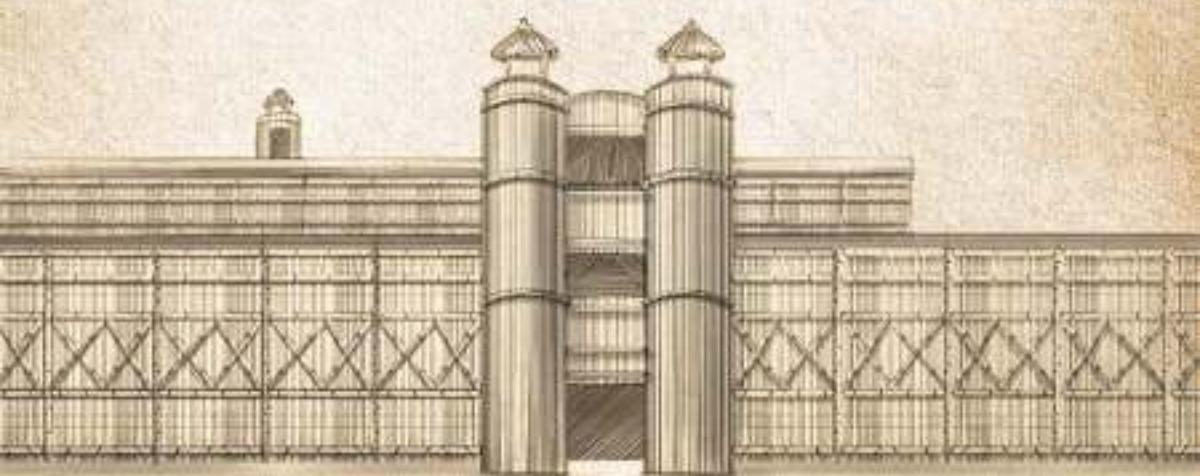
যোলো হিসেবে তোমরাও কিন্তু তোমাদের মাসজিদে এমন আয়োজন করার উদ্যোগ নিতে পারো। আমরা বরাবরের মতোই তোমাদের যথাসাধ্য সাহায্য করার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ। তোমরা এলাকার বয়োজ্যেষ্ঠদেরকে প্রস্তাব দাও। যোলোদের পদচারণায় আমাদের মাসজিদগুলো প্রাণ ফিরে পাক, গড়ে উঠুক বাতিঘর হিসেবে। আজ এ পর্যন্তই।

টা ...টা...

আমাদের নায়কেরা

তিতুমী

শহরিয়ার হোমাইন



আজ আমরা কথা বলব এমন একজন মানুষকে নিয়ে যিনি লড়াই করেছিলেন বাংলার মানুষের অধিকার আদায়ের জন্য, লড়াই করেছিলেন কৃষকদের জন্য, লড়াই করেছিলেন ইংরেজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির গোলামি করা জমিদারদের বিরুদ্ধে। কোনো রাজনৈতিক নেতার কথা বলতে আসিনি। বরং একজন সাধারণ মুসলিমের কথা বলতে এসেছি... নাম তাঁর মীর নিসার আলি। সবাই যাকে তিতুমীর হিসেবে চিনি। ১৭৮২ খ্রিষ্টাব্দে চবিশ পরগণা জেলার বাদুড়িয়া থানার চাঁপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। এই মানুষটার বাস্তব জীবনের ঘটনাগুলো আমরা কতটুকু জানি? তাহলে চলো আজ তার জীবন থেকে ঘুরে আসা যাক...

প্রায় আড়াইশ বছর আগে অত্যাচারী ইংরেজরা এদেশে কায়েম করেছিল ত্রাসের রাজত্ব। বাংলার মানুষের পায়ে পরাধীনতার শেকল পরিয়ে দিয়েছিল। যুলুম, শোষণ, লুঠন, ধর্ষণ, হত্যা ইত্যাদি ছিল ইংরেজদের রুটিন কাজ। অত্যাচারী ইংরেজদের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করেন সৈয়দ আহমদ শহীদ। ১৮২২ সালে আমাদের তিতু মিয়া তাঁর সোহৃত লাভ করেন, ইলমি শিক্ষা গ্রহণ করেন আর তাঁর পরিকল্পনা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হন। পরবর্তীতে ইলম অর্জনের নেশা তাঁকে মক্কায় নিয়ে যায়। তারপর ১৮২৯ খ্রিষ্টাব্দে তিনি মক্কা থেকে ফিরে এসে আন্দোলনে সরাসরি জড়িয়ে পড়েন।

আন্দোলনের শুরুটা ছিল ধর্মীয় ইস্যু কেন্দ্রিক। কিন্তু পরবর্তীতে জমিদার শেণির সামন্ত সম্প্রদায়, নীলকর অত্যাচারী শোষক ও ব্রিটিশ সরকারের নিপীড়নের বিরুদ্ধে আগামরণ জনসাধারণকে ঐক্যবদ্ধ করে এই আন্দোলন এক বৃহত্তর গণআন্দোলনের রূপ ধারণ করে।
আবদুল গফুর চৌধুরী লিখেছেন,

“ইংরেজের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রাণ দেবার জন্য প্রচুর নওজোয়ানকে তিনি দলে দলে পাঠিয়ে দিতেন, সঙ্গে প্রচুর টাকা-পয়সা পাঠাবারও ব্যবস্থা করতেন। সৈয়দ নিসার আলির একটা বড় সম্বল ছিল, তা হচ্ছে অগ্রিবর্ষক সৃজনশীল বক্তৃতা করার ক্ষমতা। নিসার আলি নিজেও একজন বিখ্যাত কুস্তিগীর ও ব্যায়ামবীর ছিলেন। তিনি তাঁর শিষ্যদের সশন্ত্র ট্রেনিং দিতেন।”^[১]

তিতুমীর ছিলেন বাংলা, আরবি আর ফারসি ভাষায় দক্ষ। তাঁর বক্তৃতা সবাইকে আকৃষ্ট করত। জমিদাররা ছিল হিন্দু সম্প্রদায়ের, তারা নানাভাবে মুসলিমদের নির্যাতন করত। আর হিন্দুদের নিচুগোত্রের মানুষদেরকেও নানা রকম বখন্নার শিকার হতে হতো সে জমিদার শেণির কাছ থেকে। তিনি এও লক্ষ্য করলেন, হিন্দু জমিদাররা জাতিধর্ম নির্বিশেষে সকল প্রজার কাছ থেকে জোর করে পূজোর চাঁদা, বেআইনি কর ইত্যাদি আদায় করে। ইংরেজ নীলকররা হিন্দু জমিদারদের বন্ধু এবং তাই নীলকরদের সাথে সাথে হিন্দু জমিদারদের দ্বারাও বাংলাদেশের কৃষক সমাজ নির্যাতিত ও নিপীড়িত। তিতুমীর তা সহ্য করতে না পেরে নীলকর কুঠিয়াল ও হিন্দু জমিদারদের বিরুদ্ধে সোচ্চার কঠে আওয়াজ তুললেন।

কিন্তু জমিদার বাবুরাও তো বসে থাকার মানুষ নয়। তারাও তিতুমীরের বিরুদ্ধে যড়যন্ত্র করতে লাগল। ভাবতে লাগল, যে করেই হোক তিতুমীরকে শায়েস্তা করতে হবে।

অবশেষে জমিদার কৃষ্ণদেব রায় তিতুমীরকে শায়েস্তা করার জন্য পাঁচদফা ফরমান জারি করল। এবং মুসলমানদের ধর্মীয় বিধিবিধানের ওপর হস্তক্ষেপ করল। জমিদার ও নীলকর

[১] শহীদ তিতুমীর, পৃষ্ঠা – ৩০/৩১

কৃষ্ণদেব রায় তিতুমীরের অনুগামীদের দাড়ির ওপর (মাথা পিছু আড়াই টাকা), মাসজিদ নির্মাণের জন্য অতিরিক্ত কর, পিতা-পিতামহ বা আত্মীয় স্বজনদের দেওয়া নাম পরিবর্তন করে ও ওয়াহাবি মতে আরবি নামকরণের জন্য অতিরিক্ত কর ইত্যাদি জারি করে।^[১]

তিতুমীর জমিদার কৃষ্ণদেব রায়কে ইসলামের বিধিবিধানের ওপর হস্তক্ষেপ প্রত্যাহার করার জন্য একটি পত্র দিলেন। পত্রে তিতুমীর প্রজ্ঞার পরিচয় দেন। তিনি লেখেন,

“আমি আপনার প্রজা না হলেও আপনার স্বদেশবাসী। আমি লোক পরম্পরায় জানতে পারলাম যে, আপনি আমার ওপর অসম্ভট্ট হয়েছেন। আমাকে ‘ওহাবি’ বলে আপনি মুসলমানদের নিকট হেয় করবার চেষ্টা করেছেন। আপনি কেন এরকম করছেন বুঝতে পারছি নে। আমি আপনার কোনো ক্ষতি করিনি। যদি কেহ আমার বিরুদ্ধে আপনার নিকট কোনো মিথ্যা কথা বলে আপনাকে উভেজিত করে থাকে, তাহলে আপনার উচিত ছিল, সত্যের অনুসন্ধান করে হৃকুম জারি করা। আমি ‘দ্বীন – ইসলাম’ প্রচার করছি। মুসলিমদেরকে ইসলাম ধর্ম শিক্ষা দিচ্ছি। এতে আপনার অসন্তোষের কী কারণ থাকতে পারে? যার ধর্ম সেই বুঝো। আপনি ইসলাম ধর্মের ওপর হস্তক্ষেপ করবেন না। ওহাবি ধর্ম নামে পৃথিবীতে কোনো ধর্ম নেই। আল্লাহর মনঃপুত ধর্মই ইসলাম। একমাত্র ইসলাম ধর্ম ব্যতীত আর কোনো ধর্মই জগতে শান্তি আনয়ন করতে পারে না। ইসলামি ধরনের নাম রাখা, দাঢ়ি রাখা, গোঁফ ছোঁট রাখা, টেন্ডুল আয়হার কুরবানি করা ও আকীকা কুরবানি করা, মুসলমানদের ওপর আল্লাহর ও আল্লাহর রাসূলের (ﷺ) নির্দেশ। মাসজিদ প্রস্তুত করে

আল্লাহর উপাসনা করাও আল্লাহর হৃকুম। আপনি ইসলাম-ধর্মের আদেশ, বিধিনিয়েধের ওপর হস্তক্ষেপ করবেন না। আমি আশা করি আপনি আপনার হৃকুম প্রত্যাহার করবেন।

ফকত হাকির ও না-চিজ

সৈয়দ নিসার আলি ওরফে তিতুমীর”^[২]

কিন্তু এই পত্র দেখে জমিদার কৃষ্ণচন্দ্র ক্ষোভে ফেটে পড়ে। ক্রেতে সে তিতুমীরের পত্রবাহক আমিনুল্লাহকে বন্দি করে রাখে। বন্দি অবস্থায় আমিনুল্লাহর ঘৃত্য হয়। আমিনুল্লাহ তিতুমীর প্রবর্তিত আন্দোলনের প্রথম শহীদ।

তখন জটিলতা আরও বেড়ে যায়। যেখানে তিতুমীর চেয়েছিলেন শান্তিপূর্ণ সমাধান, সেখানে জমিদার বাবু আরও উলটো ক্রোধ প্রকাশ করে। তিতুমীর চেয়েছিলেন, হিন্দু-মুসলমান সকলে মিলে ইংরেজ শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে বিদেশি শক্তিকে উচ্ছেদ করতে। কিন্তু জমিদার কৃষ্ণদেব রায়ের সাম্প্রদায়িকতা, মুসলিম বিদ্যেয়ে এবং যত্যন্ত্রের ফলে আন্দোলন বানচাল হওয়ার উপক্রম।

তিতুমীর আবার অত্যন্ত দক্ষতার সাথে সবাইকে এক করতে লাগলেন। সরফরাজপুর গ্রামে নিয়বর্ণের হিন্দুদের সঙ্গে মুসলমানদের বিরোধ উপস্থিত হলে তিনি সেখানে যান। জুমআর সালাতের পর হিন্দু-মুসলমানকে সঙ্গোধন করে বলেন যে, দুর্বল এবং যুলুমের শিকার হওয়া অনুসলিমদের সাহায্য করা আমাদের কর্তব্য। সবক্ষেত্রে তিতুমীরের বক্তৃতা শোনার জন্য দলে দলে হিন্দু-মুসলমান উপস্থিত থাকতেন। তিতুমীরের বক্তৃতার বিষয়বস্তু ছিল ইসলামে পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করা, হিন্দু কৃষকদের সাথে নিয়ে জমিদার ও নীলকরদের অত্যাচার প্রতিরোধ করা। জমিদারের অত্যাচার থেকে রেহাই

[১] উনিশ শতকের মুসলিম মানস ও বঙ্গভঙ্গ, পৃষ্ঠা – ২৫

[২] বাঙালী বুদ্ধিজীবি ও বিচ্ছিন্নতাবাদ, পৃষ্ঠা – ৪৫

পাওয়ার জন্য অনেক হিন্দু কৃষকও তিতুমীরকে আশ্রয় করতেন।

তিতুমীরের দল ভারি হতে থাকায় অত্যন্ত ভয় পেয়ে যায় জমিদার ও নীলকর কৃষদেব রায়। অত্যাচার-নির্ধারণের মাত্রা আরও বাড়িয়ে দেয়। তিতুমীর শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়ে সরাসরি জমিদারদের বিরক্তে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। দেশের অত্যাচারিত ও নিপীড়িত হিন্দু-মুসলমান সকলেই তিতুমীরের আহ্বানে সাড়া দেন। আবদুল গফুর সিদ্দিকী লিখেছেন,

“গোবরডাঙ্গার জমিদার কালীপ্রসম মুখোপাধ্যায়, গোবিন্দপুরের জমিদার দেবনাথা রায়, কলকাতার নামকরা জমিদার লাটু রায়, মোঞ্জা আটির নীলকুঠির ম্যানেজার ডেভিস সাহেব প্রায় হাজার খানেক লাঠিয়াল ও সশন্ত্র বরকান্দাজ নিয়ে তিতুমীরের মুজাহিদ বাহিনীকে আক্রমণ করলে দুপক্ষে সংঘর্ষ বাঁধে। ডেভিস সাহেব কোনোমতে পালিয়ে যেতে সমর্থ হলেও দেবনাথ রায় নিহত হয়।”^[৪]

১৮৩৯ খ্রিষ্টাব্দে তিতুমীরকে জন্ম করার জন্য ছেট লাটের নির্দেশ পেয়ে মি. আলেকজান্ডার বাদুড়িয়া থামে আসে। ফলে তিতুমীরের মুজাহিদ বাহিনীর সাথে সংঘর্ষ হয়। মি. আলেকজান্ডার প্রাণ বাঁচিয়ে পলায়ন করে। এতিহাসিক সুপ্রকাশ রায় ‘ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম’ বইতে লিখেছে, “এদিকে দলে দলে হিন্দু-মুসলমান চাষী-মজুর-তিতুর নেতৃত্বে জোটবদ্ধ হচ্ছিলেন। তাঁরা তিতুমীরকে রাজা বলে স্বীকৃতিও দিলেন।”

“এবার তিতুমীর নীল চাষীর ওপর যুরুমের প্রতিবাদে রুখে দাঁড়ালেন। তথাকথিত নিয়ন্ত্রণের

হিন্দু আর মুসলমান রায়তরা এ উপলক্ষে সংঘবদ্ধ হলেন। বারাসাতের জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেট মি. আলেকজান্ডার আলীপুরের জজ এবং জমিদার কৃষদেব রায় নাড়কেলবেড়িয়া এল সশন্ত্র বাহিনী নিয়ে। সংঘর্ষ শুরু হলো। সাহেব গুলি ছুঁড়বার নির্দেশ দিল, কিন্তু মুজাহিদ বাহিনীর দৃঢ় প্রতিরোধ শক্তি দেখে পিছু হটতে বাধ্য হলো। এ সংঘর্ষে কেউ নিহত হয়নি। তিতুমীরের এই সাফল্য চবিবশ পরগণা, যশোর ও নদীয়ার বিস্তৃত এলাকায় তাঁর প্রভাব সম্প্রসারিত হলো। ‘প্রতিক্রিয়াশীল’ কোনো কোনো শক্তি তিতুমীরের এই অগ্রগতিতে তাঁর বশ্যতা স্বীকারও করলেন। তিতুমীর পূর্ণ আজাদী (স্বাধীনতা) ঘোষণা করলেন।”^[৫]

তিতুমীরের এই বীরত্ব দেখে ইংরেজ কর্তা এবং জমিদার বাবুরা-সহ সকলেই বিচলিত হয়ে গেল। জমিদার ও নীলকর সাহেবেরা তিতুমীরের বাহিনীর কাছে টিকতে না পেরে পিছু হটতে বাধ্য হয়। তিতুমীর বেশ কয়েকটি নীলকুঠী দখল করে নেন। জমিদার ও নীলকরদের হাতে ছিল গোলাগুলি ও আধুনিক অস্ত্র, তিতুমীরের লোকদের হাতে ছিল ইঁট, কাঁচাবেল, তরবারি, তির, সড়কি, বক্স, লাঠি। তবুও সংঘর্ষ শুরু হলে প্রতিপক্ষের সৈন্যরা মার খেয়ে পালাতে বাধ্য হয়।

তিতুমীরের বাহিনীতে ফকির বিদ্রোহের অন্যতম নায়ক মিশকিন শাহ মোগ দিলে তিতুমীরের শক্তি আরও বৃদ্ধি পেল। তিতুমীর মন্ত্রী পরিষদ গঠন করলে তিনি নিজে হলেন খলীফা, প্রধানমন্ত্রী হলেন মুনশী ময়জুদুল্লিম আর গোয়েন্দা বিভাগের প্রধান হলেন মিশকিন শাহ।

রাজা কৃষদেব রায়ের মুসলিম বিদ্রোহ, তিতুমীরের বাহিনীকে মুসলিম বিদ্রোহী হিন্দুদের ওপর

[৪] শহীদ তিতুমীর, পৃষ্ঠা – ৭৯

[৫] উপমহাদেশের মুসলমান, খণ্ড – ১, পৃষ্ঠা – ৮৪

চড়াও হতে বাধ্য করেছিল। ১৮৩০ খ্রিষ্টাব্দের ৬ ডিসেম্বর ৩০০ অন্তর্ধানী মুজাহিদ বাহিনী জমিদার কৃষ্ণদেব রায়কে উৎসি শিক্ষা দেবার জন্য রওনা হলেন। গ্রামের বারোয়ারি তলায় এসে তাঁরা গরু জবাই করেন। মন্দিরের পুরোহিত গরু জবাইয়ে ক্ষুক্ষ হয়ে মুজাহিদ বাহিনীর ওপর অন্ত চালায়। ঘটনাস্থলেই কয়েকজন মুজাহিদ শহীদ হন। প্রতিশোধ নেবার জন্য মুজাহিদ বাহিনী মন্দিরের পুরোহিতকে হত্যা করেন।

বেশ কয়েকটি সংঘর্ষে তিতুমীর চূড়ান্ত সফল হওয়াতে তিনি উৎসাহিত হন। একবার পুঁড়ায় দঙ্গ হাঙ্গামা হলে জমিদারের দেড়শ বাহিনী তিতুমীরকে গ্রেফতার করতে আসে। মুজাহিদ বাহিনী বাধা দিলে জমিদার বাহিনীর সাথে তিতুমীরের বাহিনীর সংঘর্ষ বাধে। এই ঘটনায় দারোগা নিহত হয় এবং অনেক পাইক বরকান্দাজ হতাহত হয়। সৈয়দ আহমদ শহীদ পেশোয়ারে স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করলে তিতুমীরও উৎসাহিত হয়ে উঠেন এবং ঘোষণা করেন, এ দেশে ইংরেজদের থাকার কোনো অধিকার নেই। মুসলমানদের উৎখাত করে এদেশে ইংরেজ ক্ষমতা দখল করেছে; তাই মুসলমানরা এ দেশের দাবিদার। মুসলমানদের প্রতিনিধি হিসাবে জমিদারের কাছ থেকে তিনি রাজস্ব দাবি করলেন।^[৬]

তবে সাময়িক সাফল্য লাভ করলেও তিতুমীর বুঝতে পেরেছিলেন, বিরোধী জমিদার ও নীলকররা বসে থাকার পাত্র নয়। তারা আবার তাঁর ওপর আঘাত হানতে পারে। তাই তিনি সুরক্ষার জন্য নারকেলবেড়িয়া গ্রামে বাঁশের কেঁচো নির্মাণ করলেন। এবং সেখানে হাতিয়ার হিসাবে রাখলেন তির, বর্ষা, লাঠি, ইঁট, পাথর

ও কাঁচা বেল। বিহারীলাল সরকার লেখেছে, “কেঁচো বাঁশের হটক, ভরতপুরের মাটির কেঁচোর মতোন সুন্দর সুগঠিত সুরক্ষিত না হটক সে কেঁচোর রচনাকৌশল দৃশ্যময়। কেঁচোর ভিতর যথারীতি অনেক প্রকোষ্ঠে নির্মিত হইয়াছিল, কোনো প্রকোষ্ঠে আহার্যদ্রব্য স্তরে স্তরে বিন্যস্ত ছিল। কোনো প্রকোষ্ঠে তরবারি, বর্ষা, সড়ক। বাঁশের ছেট লাঠি সংগৃহীত ও সজ্জিত ছিল, কোনো প্রকোষ্ঠে স্তপাকারে কাঁচাবেল ও ইষ্টখণ্ড (ভাঙ্গা ইট) সংগৃহীত হইয়াছিল। এই কেঁচোর কৌশল-কায়দা তিতুমীরের বুদ্ধি ও শিল্প চাতুর্যের পরিচায়ক। তিতুমীর তাঁহার অনুচরবর্গের ধারণা হইয়াছিল এই কেঁচো বাঁশের হইলেও প্রস্তর নির্মিত দুর্গ অপেক্ষা দুর্জয় ও দুর্ভেদ্য।”^[৭]

তিতুমীরের এই বাঁশের কেঁচো ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসের এক অভিনব কৌশল ছিল।

১৮৩১ খ্রিষ্টাব্দের ১৪ই নভেম্বর। কর্ণেল স্টুয়ার্টের নেতৃত্বে ইংরেজ সৈন্যবাহিনী নারকেলবেড়িয়া গ্রামে এসে পৌঁছাল। কর্ণেল এসেছিল তিতুমীরকে গ্রেফতার করতে। কর্ণেল গ্রেফতারি পরোয়ানা পাঠ করে জানাল যে, তিতু আত্মসমর্পণ করতে রাজি আছে কি না। তিতুমীর জানিয়ে দিলেন যে, তিনি আত্মসমর্পণ করবেন না। কর্ণেলের আদেশে গুলি বর্ষণ শুরু হলো। মুজাহিদ বাহিনীও তির ছুঁড়তে শুরু করল। শুরু হয়ে গেল ভয়ঙ্কর যুদ্ধ। কর্ণেল বাহিনীর কাছে হাতিয়ার হিসাবে ছিল, তরবারি, বন্দুক, কামান প্রভৃতি অত্যাধুনিক হাতিয়ার। কিন্তু তিতুমীরের বাহিনীর কাছে ছিল তীর, বর্ষা, লাঠি, ইঁট, পাথর ও কাঁচা বেল প্রভৃতি অনুমত হাতিয়ার। প্রথমে উভয়পক্ষের কোনো ক্ষতি হয়নি। কর্ণেল

[৬] উপমহাদেশের মুসলমান, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা - ৮১, এম মুনিরুজ্জামান

[৭] তিতুমীর, পৃষ্ঠা - ৭০

কামানের ফাঁকা আওয়াজ ছুঁড়ল কিন্তু মুজাহিদ
বাহিনীর তির-বর্ণণ চলতেই থাকল।

তিতুমীর বুবাতে পারেন, কামানের সামনে তাঁর
সামান্য অস্ত্র কিছুতেই টিকতে পারবে না। তাই
তিতুমীর, মাসুম আলি ও মিসকিন খাঁ মুজাহিদ
সৈন্যদের বলেলেন – আমাদের কামান নেই,
হয়তো মৃত্যু হতে পারে; যদের ইচ্ছা যুদ্ধ থেকে
বিরত থাকতে পারো। কিন্তু এমন একটিও দুর্বল
হৃদয় সেদিন পাওয়া গেল না, যে প্রাণ দিতে
কুষ্ঠিত।

যুদ্ধ আরম্ভ হতেই হৃক্ষার ছেড়ে ইংরেজ সৈন্যদের
আক্রমণ করল বিশ্ববী সৈন্য। ইংরেজ সৈন্য
ছত্রভঙ্গ হবার উপক্রম, কিন্তু কালিবিলম্ব না করে
বিরাট কামান গর্জে উঠল। কামান পরিচালককে
হত্যা করার জন্য সেনাপতি মাসুম বিদ্যুৎগতিতে
লাফিয়ে গিয়ে কামানের ওপর দাঁড়ালেন। কিন্তু
তার কয়েক সেকেন্ড পুরোই কামান দাগা হয়ে
গিয়েছিল। অজস্র বিশ্ববী সৈন্য ইংরেজের
কামানের গোলায় ছিন্নভিন্ন হয়ে মৃত্যুর কোলে
ঢলে পড়লেন। ওদিকে মাসুম তো একেবারে
ইংরেজদের কোলে গিয়ে উপস্থিত। আর কয়েক
সেকেন্ড আগে লাফ দিতে পারলে হয়তো কামান
মাসুমের হাতেই এসে যেত। মাসুম বন্দি হলেন।^[৮]
কামানের গোলায় আকাশে বাতাসে আগুন
ঝরতে লাগল। বিষাক্ত বারদের গন্ধে দিগন্ত জুড়ে
ধূমাচ্ছম হয়ে পড়ল। সেই সময় তিতুমীর সালাত
পড়ছিলেন। কামানের গোলায় তিতুমীরের ডান
হাতের হাড় ভেঙ্গে চুর্ণ-বিচুর্ণ হয়ে গেল। তিতুমীর
বীরের মতো যুদ্ধ করে শাহাদাতের পেষালা পান
করলেন। এই চরম যুদ্ধে বাংলার বীর নায়কের
জীবন অবসান হয়।

ইংরেজ বাহিনীর হাতে গ্রেফতার বিশ্ববী সৈন্যদের
শুরু হয় বিচারের নামে প্রস্তুত। সেনাপতি
গোলাম মাসুমকে ফাঁসির কাছে বোলানো হয়।
বিহারী লাল সরকার লেখেছে, “বন্দিদিগের
বিচার আলীপুরে হইয়াছিল। সর্বমোট তিনিশত
বন্দির মধ্যে একশত চালিশ জনের কারাদণ্ড
হইয়াছিল। সেনাপতি শেখ গোলাম মাসুমের
প্রাণদণ্ড হইয়াছিল।”^[৯]

যাইহোক, ৮০০ জন বন্দির মধ্যে ৩০০ জনের
বিচার হয় এবং বিচারে ১২৫ জনের ২-৭ বছর
ও ১১ জনের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ও অনেকের
দ্বিপাস্তর হয়। অভিযুক্তদের মধ্যে সাজন শাহ
ছিলেন একজন। মিসকিন শাহ অন্তর্ধান হয়ে
যান।

তিতুমীরের মৃত্যুর পর তাঁর ক্ষতবিক্ষত লাশ
হ্রগলি গ্রামের লোকেরা সমাধিস্থ করে বলে
জানা যায়। অনেকের ধারণা মি. আলেকজান্ডার
তিতুমীরের লাশকে পুড়িয়ে ফেলার চেষ্টা
করেছিল, যাতে শহীদের স্মৃতিস্তম্ভ না রাচিত হয়
এবং তিতুর অনুগামীরা যাতে পুনরায় অগ্রিমত্বে
দীক্ষিত না হয়। কিন্তু প্রকৃত শহীদের মৃত্যু
কোথায়?

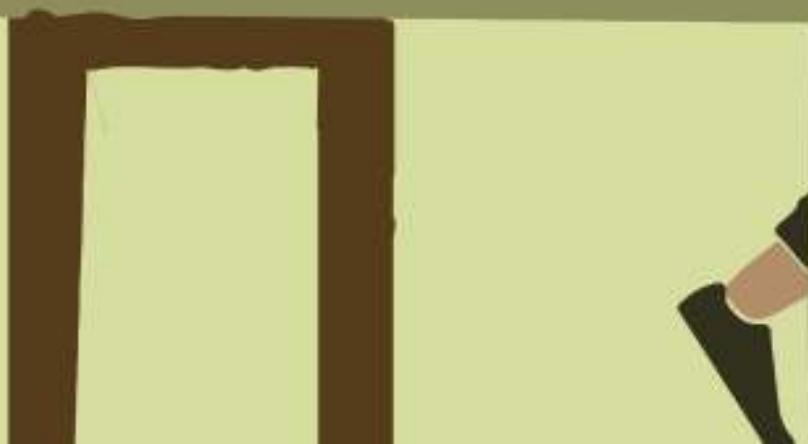
তিতুমীর জীবিত আছেন বাংলার মানুষের
অস্তরে। জীবিত থাকবেন চিরকাল।

[৮] চেপে রাখা ইতিহাস, গোলাম আহমদ মোর্তাজা, পৃষ্ঠা
– ২১৪

[৯] তিতুমীর, পৃষ্ঠা – ৭০

দীপুর প্রচ্ছদমেৰ

আনন্দি আবদুল্লাহ



দীপু বসে আছে শহিদুল সাহেবের অফিস ঘরে। এক কামরার অফিস। অফিসের মাঝখানে বিশাল আকৃতির টেবিল পাতা রয়েছে। যার এক পাশে বসে আছে দীপু, অন্য পাশে শহিদুল সাহেব। টেবিলের ওপর শহিদুল সাহেবের ব্যবসার বেশ কিছু টাকা ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। তিনি সেই টাকাগুলো সাজিয়ে নিয়ে গুনতে শুরু করেছেন। দীপুর দিকে একবারও চোখ তুলে তাকাচ্ছেন না। অপেক্ষা করছে দীপু। শহিদুল সাহেব একবার চোখ তুলে তাকালেই কথা বলা শুরু করতে পারে সে। সমস্যা হলো কথার শুরুটা কীভাবে করবে, দীপু ঠিক বুবাতে পারছে না। সে কেন এসেছে, সেই বিষয়টা উপস্থাপন করতে যেই পরিমাণ সাহস তার প্রয়োজন সেটা এখনো বুকে ধারণ করা সম্ভব হচ্ছে না। জীবনে প্রথম এমন অপরিচিত কারও কাছে টাকা চাইতে এসেছে সে। ভিক্ষা কিংবা সাহায্য নয়, ঝগ চাইবে।

বাবার মৃত্যুর আগ পর্যন্ত দীপুকে কখনো এভাবে টাকার জন্যে অন্যের কাছে ছোটাছুটি করতে হয়নি। সুধের সংসার ছিল দীপুদের। বাবা-মা আর দীপু মিলে ছেট সুধের সংসার। বাবা মারা যাওয়ার পর সব এলোমেলো হয়ে গেছে। মা এখন খুব অসুস্থ। দীপু মাত্র এসএসসি পাশ করেছে। ঘরে কামাই রোজগার করার কোনো মানুষ নেই। বাবার জমানো কিছু টাকা ছিল। তার মৃত্যুর পর, সেই টাকা ভেঙেই চলেছে দীপুদের সংসার। এরপর আঘাত-স্বজনরা কিছুদিন সাহায্য সহযোগিতা করেছে। ইদনীং আঘাতীরা আর সাহায্য করার আগ্রহ পাচ্ছে না। আজ সকালে মায়ের ওযুধ শেষ হয়ে গেছে। দু-বেলা খাবার যোগাড় করা যে সংসারে কঠিন কাজ, সেখানে ওযুধ কেনা এক রকম বিলাসিতার পর্যায়ে পড়ে। কিন্তু মায়ের শরীরের যে অবস্থা, তাতে ওযুধ না-দেয়া হলে আঞ্চাহ না করুক কোনো দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে বলে আশক্ষা দীপুর। তাই মাকে কিছু

না-বলে, ওযুধ কেনার টাকা জোগাড় করতে বেরিয়ে পড়েছে দীপু। প্রথমে গিয়েছিল বড় চাচার বাসায়। এর আগে কয়েকবার অল্প কিছু টাকা দিয়ে সাহায্য করেছিলেন বড় চাচা। এবার দীপুর কথা শুনে মুখ গন্তীর করে বললেন :

এলোপ্যাথি ওযুধ তো আসলে ওযুধ না। ওগুলো বিষ। আমি নিজেও আগে এক গাদা ওযুধ খেতাম। এখন বেশির ভাগই ছেড়ে দিয়েছি। ইদনীং আমি ভেজ ট্রিটমেন্ট নিছি। বুঝলি দীপু, আসল ওযুধ হলো ভেজ ওযুধ। তোর মাকে এলোপ্যাথি না খাইয়ে, বরং ভেজ খাবার খাওয়া। বুকে ব্যথার জন্যে পাথর চুনা পাতা লবণ দিয়ে খেতে বল। জাদুর মতো কাজ করবে। গলায় কফ জমলে তুলসী পাতা পেস্ট করে, সেই পেস্ট খাইয়ে দিবি। সব ঠিক হয়ে যাবে বুঝলি। ডায়ারেটিস অতিরিক্ত বেড়ে গেলে খাওয়াবি নিম পাতার রস এক চামচ করে। ব্যাস, দেখবি ডায়ারেটিস পেছনের দরজা দিয়ে পালাবে। আমার ছাঁদে পাথর চুনা পাতা আর তুলসী পাতা দুটোই হয়েছে। ছাঁদে গিয়ে প্রয়োজন মতো ছিঁড়ে নিয়ে যা। পাশের বাসার উঠানে একটা বড় নিম গাছ আছে। সেখান থেকে নিম পাতা নিয়ে যেতে পারিস।

বড় চাচা কী বলতে চাইছেন, সহজেই বুঝল দীপু। সে ছাঁদে গিয়ে পাথর চুনা পাতা কিংবা তুলসী পাতা আনল না। মাথা নিচু করে বের হয়ে এল বড় চাচার বাড়ি থেকে। এরপর গেল একমাত্র মামার বাসায়। মামার কাছে টাকা চাইতেই, তিনি ক্ষ কুঁচকে বলল,

- তোর চাচার কাছে গিয়েছিলি?
- দীপু হ্যাঁ সূচক মাথা নাড়ল।
- কী বললেন তিনি?
- কিছু বলেনি।
- টাকা দেয়নি তোকে?

দীপু চুপ করে রইল। মামা কঠিন্যের উঁচিয়ে বলল,
-এ কেমন কথা। তোর চাচার তো একটা দায়িত্ব
আছে না-কি? নিজের ছোট ভাইয়ের সংসারকে
সে এভাবে অবহেলায় ফেলে রাখতে পারে না।
তুই এখনি তার কাছে আবার যাবি। এবং জোর
গলায় তোর দাবি জানাবি। এখনি চলে যা। দেরি
করিস না।

দীপু দেরি করল না। দ্রুত বেরিয়ে এল মামার বাসা
থেকে। মনটা ভীষণ খারাপ করছিল দীপুর। ঠিক
সেই মুহূর্তে তার মনে পড়ল শহিদুল সাহেবের
কথা। বাবার একমাত্র বন্ধু, যিনি বাবাকে ধরে
ধরে মাসজিদে নিয়ে যেতেন। বাবার থেকে বয়সে
অনেক বড় হলেও বাবার সাথে বেশ স্থ্য ছিল
শহিদুল সাহেবের। বড় একজন ব্যবসায়ী তিনি।
দীপু দু-একবার বাবার সাথে শহিদুল সাহেবের
অফিসে এসেছিল। শহিদুল সাহেবের অফিসে
এলেই দীপুর হাতে সৌন্দি থেকে আনানো কাঁচা
খেজুর তুলে দিতেন শহিদুল সাহেবে। দীপু বেশ
মজা নিয়ে থেত। আজকে যখন দীপু তার মামা-
চাচার কাছ থেকে মায়ের ওযুধের টাকা জোগাড়
করতে ব্যর্থ হলো, তখনই কী মনে করে ছুটে
এল শহিদুল সাহেবের অফিসে। এরপর থেকেই
দীপু তার সামনে বসে আছে। শহিদুল সাহেবে
বেশ কিছুক্ষণ পর দীপুর দিকে চোখ তুলে
তাকিয়ে অমায়িক হাসি দিলেন। হাসির উভরে
হাসি উপহার দিতে হয়। এটাই নিয়ম। দীপুর
এখন মোটেই হাসিমুখ করে বসে থাকতে ইচ্ছে
করছে না। তারপরও নিয়ম রক্ষার্থে সে খানিকটা
হাসার চেষ্টা করল। শহিদুল সাহেবে বললেন :

- কিছু মনে কোরো না। তোমাকে ঠিক চিনতে
পারছি না, বাবা।
- আমি দীপু। আপনার বন্ধু রহমত সাহেবের
ছেলে আমি।
- ওহ আচ্ছা। রহমত ভাইয়ের ছেলে তুমি।

- জি।

খুব ভালো মানুষ ছিলেন তোমার বাবা। নিয়মিত
সালাত পড়া শুরু করেছিলেন। তাওো করে
ফিরে এসেছিলেন দীনে। আঙ্গাহ উনাকে কবুল
করুন। তোমাকে অনেকক্ষণ বসিয়ে রেখেছি,
দৃঢ়খিত।

দীপু লজ্জিত গলায় বলল, অসুবিধা নাই।

শহিদুল সাহেব মুখের হাসি প্রশংসন্ত করে বললেন,
টাকা পয়সা গণনার ক্ষেত্রে আমি বেশ কাঁচা মানুষ
বুঝলে দীপু। এই দেখো না কত টাকা এখনো
এলোমেলো হয়ে পড়ে আছে। ভেবেছিলাম সব
টাকা গুছিয়ে, গুনে শেষ করে তারপর তোমার
সাথে কথা শুরু করব। এখন বুঝতে পারছি সেটা
সম্ভব হবে না।

দীপু বিনয়ের সাথে বলল,

- আপনি কাজ শেষ করেন, আমি পরে আসব।
- না না, বসো তুমি। আমি পরে গুনে নেব,
সমস্যা নেই।

বলেই টাকাগুলোকে একসাথে করে একটা
পেপার ওয়েট দিয়ে চাপ দিয়ে রাখলেন শহিদুল
সাহেব।

হাসিমুখে বললেন,

- এখন বলো, কী জন্যে এসেছ?
- আপনাকে দেখতে এসেছি।

কথাটা বলেই রাগে দীপুর গা জলে উঠল। সে
এসেছে টাকা চাইতে। ভণিতা না করে সরাসরি
চেয়ে নিলেই ল্যাট্যা চুকে যায়। ধার চাইতে
এসেছে সে, ভিক্ষা নয়। সুতরাং তার এতে লজ্জা
পাওয়ার কিছু নেই। তারপরও অঙ্গুত ব্যাপার
হচ্ছে, মুখ ফুটে টাকার কথা বলতে পারছে না
দীপু। তার মাথা ঘূরাচ্ছে।



ତବେ ଶହିଦୁଲ ସାହେବ ଦୀପୁର ମନେର ଅବସ୍ଥା ବୁଝାତେ
ପେରେଛେ ବଲେ ମନେ ହଜୋର ନା । ବରଂ ଦୀପୁର କଥା
ଶୁଣେ ତାର ଚୋଥ ଚକ ଚକ କରତେ ଶୁରୁ କରେଛେ ।
ତିନି ଆଦୁରେ ଗଲାଯ ବଲଲେନ, ବାହ ! ଯେମନ
ବାବା, ତେବେଇ ତାର ଛେଲେ । ତୋମାର ବାବାଓ କିଷ୍ଟ
ଆମାକେ ଦେଖିତେ ଛଟ ହାଟ ଆମାର କାହେ ଚଲେ
ଆସତନ । ବିଶେଷ କରେ ଗତ ରମାଦାନେ ପ୍ରତିଦିନଇଁ
ଆମି ଆର ତୋମାର ବାବା ଏକସାଥେ ହେଁ ଅନେକ
ଗଲ୍ଲ କରେଛି ।

ଦୀପୁ କୌତୁଳ୍ଲି ହେଁ ଜିଞ୍ଜେସ କରେ :
କୀ ଗଲ୍ଲ କରତେନ ବାବା ଆପନାର ସାଥେ ?

- ମେ ଅନେକ ଗଲ୍ଲା ରମାଦାନେ ସବ ରମାଦାନ ବିଷୟକ
ଗଲ୍ଲ ହତୋ । ସାଓମ ରାଖାର ଗୁରୁତ୍ୱ ନିଯେ ଆଲୋଚନା
ହତୋ ।

ଦୀପୁ ଗନ୍ତୀର ଗଲାଯ ବଲଲ, ବାବା ଗତ ବଚରଇଁ ପ୍ରଥମ
ରମାଦାନ ମାସେ ସାଓମ ରାଖା ଶୁରୁ କରେଛିଲେନ ।

ହ୍ୟାଁ । ତୋମାର ବାବା ନାସ୍ତିକତା ଥେକେ ଦୀନେ ଫିରେ
ଆସାର ପର ସେଟାଇ ଛିଲ ତାର ଜୀବନେର ପ୍ରଥମ
ରମାଦାନ । ଏବଂ ତିନି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଯତ୍ନେର ସାଥେ ସବ
ଗୁଲୋ ସାଓମ ରେଖେଛିଲେନ, ଆଲହାମଦୁଲିଲ୍ଲାହ ।

ଦୀପୁ ମାଥା ନିଚୁ କରେ ବଲଲ, ଆମାକେଓ ବାବା
ଗତବାର ଅନେକ ଅନୁରୋଧ କରେଛିଲେନ ସାଓମ
ରାଖିତେ । ଆମି ରାଖିନି ।

- ତୁମି କି ଆଲ୍ଲାହକେ ବିଶ୍ୱାସ କରୋ, ଦୀପୁ ?
- ହୁମ, ବିଶ୍ୱାସ କରି । ବାବା ସଥିନ ଅବିଶ୍ୱାସୀ ଛିଲେନ,
ତଥିନୋ ଆମି ଆର ମା ଆଲ୍ଲାହକେ ବିଶ୍ୱାସ କରତାମ ।
ଏଥିନୋ କରି ।

- ତାହଲେ ସାଓମ କେନ ରାଖୋନି ?
- ଥିଦେ ଲେଗେ ଯାଯ । ଅଭ୍ୟାସ ନେଇ ।
ଶହିଦୁଲ ସାହେବେର ମୁଖେ ଏତକ୍ଷଣ ପ୍ରଶନ୍ତ ହାସି
ଛିଲ । ସେଇ ହାସି ଏକଟୁ ମିହିୟେ ଗେଛେ । ତିନି
ଗନ୍ତୀର ମୁଖ କରେ ବଲଲେନ, ଦେଖୋ ଦୀପୁ, ଆଲ୍ଲାହ
ଈମାନଦାରଦେର ଜନ୍ୟେ ରମାଦାନ ମାସେର ସାଓମ ଫରସ
କରେଛେନ । ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲା ବଲେନ,

**‘କେ ଈମାନଦାରଗଣ, ତୋମାଦେର ଓପର ସାଓମ
ଫରସ କବା ଥିଲେଛେ, ଯେଉଁବେ ତୋମାଦେର
ପୂର୍ବବତୀଦେର ଓପର ଫରସ କବା ଥିଲେଛିଲି, ଯାତେ
ତୋମରା ମୁହାରୀ ଥିଲେ ପାରୋ ।’ [୧]**

ଏହି ଆୟାତେ ଆଲ୍ଲାହ ଆମାଦେର ବଲେଛେନ ଯେ,
ଈମାନଦାରଦେର ଜନ୍ୟେ ସାଓମ ରାଖା ଫରସ । ତୋମାକେ
ମଜାର ଏକଟା ତଥ୍ୟ ଦିଇ ଦୀପୁ । ଏହି ଆୟାତେର
ଦିକେ ଲକ୍ଷ କରୋ - ସାଓମ ଯେ କେବଳ ରାସୁଲୁଲ୍ଲାହ
ﷺ-ଏର ଉତ୍ସାତେର ଓପରଇ ଫରସ କବା ହେଁଲେ,
ବିଷୟଟା ଏମନ ନୟ । ପୂର୍ବବତୀ ନବିଗଣ ଏବଂ ତାଁଦେର
ଉତ୍ସାତେର ଓପରେଓ ସାଓମ ଫରସ ଛିଲ । ସାଓମେର
ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କୀ, ବଲତେ ପାରବେ ?

- ଜି ନା ।

[୧] ସୂରା ବାକାରା, ୨ : ୧୮୩ ।

সাওমের মূল উদ্দেশ্য হলো তাকওয়া অর্জন করা। ইসলামের যে পাঁচটি ভিত্তি আছে, সাওম তার মধ্যে অন্যতম। বুখারি আর মুসলিমের একটা হাদিসে বলা হয়েছে,

‘ইমামের ভিত্তি পাঁচটি। ক. এ কথার মাঝ্য দেওয়া যে, আল্লাহ ছাড় কেনে ইন্নাহ নেই এবং মুঘ্যমাদ (সল্লাল্লাহু আলাহু ওয়া মাল্লাম) আল্লাহর বাসুন্ধা। খ. সালাত কর্যে করা। গ. যাকত আদায় করা। ঘ. অক্ষ পালন করা এবং ঙ. রমাদানের সাওম রাখা।’^[১]

তুমি কি আমার কথা শুনছ, দীপু?

দীপু মাথা নিচু করে বসে ছিল। এবার মাথা উঁচিয়ে হেসে বলল, জি শুনছি।

শহিদুল সাহেব বললেন, এ বছরের রমাদান মাসও তো চলে এল বলে। আগে কী করেছ সেটা ভুলে যাও। এবারের রমাদান থেকে সাওম রাখা শুরু করে দিয়ো, কেমন?

চাচা, বাবা আগে রোজা রাখতেন না একদম। তাই আমিও রাখতাম না। এখন একদম অভ্যাস চলে গেছে রোজা রাখার। আর তাছাড়া, আমি তো অনেক গুনাহ করি। এরকম গুনাহগার হয়ে রোজা রেখে কী লাভ।

শয়তানকে সুযোগ দিয়ো না, দীপু। সে তোমাকে বাজে লজিক দিয়ে সাওম থেকে বিরত রাখতে চাইবে। শয়তানের কথায় ভুল করবে না। বরং তুমি যদি গুনাহগার হও, তোমার উচিত রমাদান মাসের সাওমের সাথে পরবর্তী নফল সাওমও রাখ। সাওম কিন্তু গুনাহ মাফের একটি মাধ্যম।

রমাদান মাসের সাওম এতটা মহিমাপূর্ণ একটি আমল, যার মাধ্যমে আল্লাহ রাবুল আলামীন বান্দার অতীতের সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন,

‘যে ব্যক্তি মৈমান এবং ঈতিমাব তথ্য আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস এবং সাওয়াবের প্রভ্যাশ গ্রহে রমাদান মাসে সাওম রাখবে, তার পূর্বের গুরুত্বপূর্ণ মাফ করে দেওয়া থবে।’^[২]

দীপু বুঝতে পারছে, এই বৃদ্ধ তাকে পেঁচিয়ে ফেলছে। বৃদ্ধের কথায় অঙ্গুত এক আকর্ষণ আছে। তার কথা শুনতে নেশার মতো হয়ে যায়। ভালো লাগে। তবে বৃদ্ধের কথার প্যাচ আরেকটু শক্ত হলে, এখান থেকে উঠে বের হওয়াই মুশকিল হবে। মুখ ফুটে মায়ের ওষুধের জন্যে টাকার কথাটা আর বলা হবে না। যা বলার এখনই বলতে হবে তাকে। দীপু ইতস্তত করে বলল, চাচা একটা কথা বলতে চাচ্ছিলাম।

শহিদুল সাহেব এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে দীপুর দিকে। দীপুর প্রশংশ শোনার আগ্রহ তার মধ্যে বেশ কাজ করছে। দীপু বলল, চাচা যারা নিদারণ অর্থ কঢ়ে ভুগছে, এমন মানুষদের জন্যেও কি সাওম ফরয?

শহিদুল সাহেব ডান হাত দিয়ে টেবিলে হালকা চাপার দিয়ে বলল, আল্লাহ। তাদের জন্যেও সাওম ফরজ। আরে ব্যাটা, সাওমের প্রতিদান আল্লাহ তাঁর বান্দাকে স্বয়ং নিজে দেবেন। সহীহ মুসলিমের বর্ণনায় এসেছে,

‘আল্লাহ তাঁর মাননের মকন রাখেন, মকন আমনের

[১] বুখারি, ৮; মুসলিম, ১৬।

[২] বুখারি, ৩৮।

সাওয়াব তো (একবক্ম) নির্ধারিত। অর্থাৎ প্রতিটি নেকি দশ থেকে সাতশ গুণ বাড়িয়ে দেওয়া থবো তবে বোজাব বিষয়টি এব বৃত্তিক্রম। কেননা সাওম একমাত্র আল্লাহর জন্যই থয়ে থাকে। আব তাঁ এব প্রতিদান আল্লাহ নিজেই দেবেন।’^[৪]

দীপু শ্রু কৃঞ্জিত করে জিজেস করল,
স্বয়ং আল্লাহ পুরস্কার দেবেন ভালো কথা। কিন্তু পুরস্কারটা কী?

আল্লাহ কেমন প্রতিদান দেবেন তা আল্লাহ-ই ভালো জানেন দীপু। আমরা শুধু বুঝি, যে প্রতিদান আল্লাহ বিশেষভাবে দেবেন তা তাঁর শান মোতাবেক দেবেন। সাওমের ক্ষেত্রে বান্দার জন্য আল্লাহর তরফ থেকে এত বড় সম্মান ও পুরস্কার এ জন্য যে, সাওম সাধারণত আল্লাহর জন্যই হয়ে থাকে। অন্যান্য আমলের তুলনায় সাওমের ক্ষেত্রে রিয়ার আশক্তও কম থাকে। সেজন্যই আল্লাহ বলেছেন, সাওম আমার জন্য। আব এজন্যই আল্লাহ নিজে সাওমের প্রতিদান দেবেন। মজার ব্যাপার হলো, সাওম কিন্তু তোমার ঢাল হিসেবেও কাজ করবে। মুমিনের সাওম তার জন্য ঢাল হবে। অর্থাৎ ঢাল যেভাবে মানুষকে রক্ষা করে তেমনি সাওমও সায়িমকে রক্ষা করবে। তাকওয়া হাসিলের প্রতিবন্ধকতা থেকে, গুণাহ থেকে বাঁচার ক্ষেত্রে, প্রবৃত্তি অবদমিত করার ক্ষেত্রে, কবরে-হাশরে এবং আখিরাতের সকল ঘাঁটিতে, এমনকি জাহানানের ভয়াবহ আগুন থেকে সাওম আল্লাহর ইচ্ছাতে একজন সায়িমকে রক্ষা করবে।

হাদীসে এসেছে-

‘সাওম ঢান মুকুপ, যতক্ষণ না তা বিদীর্ণ করে
ফেলা থয়।’ জিজ্ঞাসা করা থনো, কীভাবে তা

বিদীর্ণ থয়? নবিজি বললেন, ‘মিথ্যা গথবা
গীবতের মার্ধনো।’^[৫]

দীপু শহিদুল সাহেবকে থামিয়ে দিয়ে কিছু একটা বলতে চাইছিল। শহিদুল সাহেব হাত ইশারায় দীপুকে চূপ করতে বললেন। এরপর এক প্লাস পানি ‘বিসমিল্লাহ’ বলে গলায় চালিয়ে দিয়ে, সাওম বিষয়ে বিশেষ এক লেকচার শুরু করে দিলেন। দীপু বুবাতে পারল, তার কিছুই করার নেই, সে যেই পেঁচিয়ে পড়ার ভয় করছিল সেই প্যাঁচ লেগে গেছে। সে শহিদুল সাহেবের কথার প্যাঁচে আটকে গেছে। তবে আজব ব্যাপার হলো পুরো লেকচারটা শুনতে দীপুর একটুও খারাপ লাগেনি। বরং ভালো লাগছিল। মাঝে মাঝে হট করে তার মনে হচ্ছিল, শহিদুল সাহেবের জায়গায় বাবা বসে আছেন। ব্যাপারটা বেশ অঙ্গুত লেগেছে তার কাছে। শহিদুল সাহেব তার বিশাল লেকচারে সাওমের বিষয়ে বেশ কিছু ইনফরমেশন দিয়েছেন, যা দীপুর কাছে একদম নতুন লেগেছে। সেগুলোর একটা লিস্ট দীপু মনে মনে করে ফেলেছে। সেগুলো হলো :

১. সায়িমের মুখের দুর্গন্ধি আল্লাহর নিকট মিশকের চেয়েও অধিক প্রিয় : সায়িম ব্যক্তি দিনভর উপোস থাকে। অনাহারে থাকার দরুন তার মুখে একধরনের দুর্গন্ধি সৃষ্টি হয়। দুনিয়াবি বিবেচনায় তা দুর্গন্ধি মনে হলেও আল্লাহর কাছে সেটা মিশকের চাইতেও অধিক প্রিয়। নবিজি
বলেন, ‘**‘ঝ মতাব কম, যাব কজায় মুঘ্যম্বাদের প্রাণ, সায়িমের মুখের দুর্গন্ধি আল্লাহর নিকট মিশকের সুগন্ধি অপেক্ষা অধিক সুগন্ধিময়।’**^[৬]

[৪] মুসলিম, ১১৫১; বুখারি, ৫৯২৭।

[৫] নাসাই, ২২৩০; মুসনাদু আহমাদ, ১৬২৭।

[৬] বুখারি, ১৯০৪।

২. সায়িমের জন্য বিশেষ আনন্দের মুহূর্ত :
সায়িমের জন্য দুটি বিশেষ আনন্দের মুহূর্ত রয়েছে। একটি থলো, ইফতারের সময়। অপরটি থলো, যখন সে তার বরের সাথে সাক্ষাৎ করবে (সার তিনি তাকে বিশাল পুরষ্ঠার ও সম্মানে ভূষিত করবেন)।^[৭]

সায়িম ব্যক্তি দিনভর আল্লাহর হৃকুমে উপবাস থাকার পর যখন আল্লাহর হৃকুম মোতাবেক ইফতারি নিয়ে বসে, তখন তার মনে অন্যরকম আনন্দ এবং অপার্থিত প্রশাস্তির এক চেউ খেলে যায়। আর কিয়ামাতের ময়দানে যখন সে রবের নিকট থেকে সাওমের প্রতিদান গ্রহণ করবে, এই মুহূর্তটিও তার জন্য হবে অবারিত আনন্দের।

৩. সায়িমের দুআ ফিরিয়ে দেওয়া হয় না :
সায়িম ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার নিকট এতটাই মুহাববতের পাত্র যে, সে কিছু চাইলে আল্লাহ পাক তা ফিরিয়ে দেন না। নবিজি ﷺ বলেন, তিনি ব্যক্তির দুআ ফিরিয়ে দেওয়া হয় না। এক. সায়িমের দুআ ইফতারের মুহূর্ত পর্যন্ত। দুই. ন্যায়পরায়ণ শাসকের দুআ। তিনি. মায়লুমের দুআ। আল্লাহ এ দুআকে মেঘমালার ওপরে নিয়ে যান। এর জন্য আসমানের দরজাসমূহ খুলে দেন। রব বলেন, আমার ইঙ্গতের কসম, বিলম্বে হলেও আমি তোমাকে সাহায্য করব।^[৮]

৪. সায়িমের জন্য সাওম সুপারিশ করবে :
কিয়ামাতের দিন সায়িমের জন্য সাওম নিজে সুপারিশ করবে। হাদিসে এসেছে, ‘কিয়ামাতের দিন সাওম ও কুরআন বান্দার জন্য সুপারিশ করবে। সাওম বলবে, ওগো রব! দিবসে আমি তাকে পানাহার ও জৈবিক চাহিদা পূরণ থেকে

নির্বাচ রেখেছি। তার ব্যাপারে আপনি আমার সুপারিশ কবুল করুন। আর কুরআন বলবে, রাতে আমি তাকে নিদ্রা থেকে বিরত রেখেছি। তার ব্যাপারে আপনি আমার সুপারিশ কবুল করুন। অতঃপর তাদের সুপারিশ কবুল করা হবে।^[৯]

৫. সায়িমের জন্য জান্নাতে প্রবেশের বিশেষ দরজা থাকবে : সায়িম ব্যক্তি হলেন আল্লাহ তাআলার বিশেষ মেহমান। নবিজি ﷺ বলেন,

‘জান্নাতে একটি দরজা রয়েছে। নাম রাষ্ট্রযান। কিয়ামাতের দিন তা দিয়ে সায়িমরা প্রবেশ করবে। তারা বৃত্তীত অন্য কেউ সেই দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে পারবে না। ঘোষণা করা থবে, সায়িমরা কোথায়? তখন তারা আসবে। তারা ছাড়া তা দিয়ে আর কেউ প্রবেশ করবে না। সায়িমরা প্রবেশ করার পর দরজা বন্ধ করে দেওয়া থবে। এরপর আর কেউ সেই দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে পারবে না।’^[১০]

শহিদুল সাহেব আল্লাহর পক্ষ থেকে রোজার প্রতিদানগুলো এত আকর্ষণীয়ভাবে বর্ণনা করছিলেন, দীপুর মনে হচ্ছিল, রোজা রাখা শুরু করলেই দুনিয়াতে তার সব সমস্যাগুলো সমাধান হয়ে যাবে। কারণ, আল্লাহই তার সমস্যা সমাধান করে দেবেন। দীপুর চোখে ঘোর লেগে আছে। শহিদুল সাহেবের কথা তার চোখে ঘোর তৈরি করেছে। শহিদুল সাহেবও ব্যাপারটা বুঝতে পারছেন। তিনিও কথা বলে বেশ আনন্দ পাচ্ছেন। তিনি খানিক নড়েচড়ে বসে আবার কথা শুরু করলেন।

দীপু কথা শুনতে খারাপ লাগছে ?

[৭] মুসলিম, ১১৫১।

[৮] তিরমিয়ি, ৩৫৯৮; ইবনু মাজাহ, ১৭৫২; মুসনাদু আহমাদ, ৯৭৪৩।

[৯] তাবারানী, আল-মু'জামুল কাবীর, ১৪৬৭২; আরও দেখুন : হাইসামি, মাজমাউয় যাওয়াইদ, ৫০৮১, ৩৩১০।

[১০] মুসলিম, ১১৫২।

- জি না।

গুড়। শোনো, রমাদানে বেশি বেশি কুরআন তিলাওয়াত করতে হয়। রমাদান মাস কুরআন নাযিলের মাস। আল্লাহ তাআলা কুরআন নাযিল করেছেন এ মাসে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

‘রমাদান মাস, যে মাসে কুরআন নাযিল করা
যয়েছে, যা মানবজাতির জন্য প্রিয়তম দিশায়ী, যাংপথের প্রস্ত নির্দশন এবং সত্য
ও মিথ্যার মধ্যে চূড়ান্ত ফায়দানা করে দেয়।
সুতরাং তোমাদের মধ্যে যে বৃক্ষিষ্ট এ মাস
পাবে, মে যেন অবশ্যই সাওম বাধ্য।’^[১১]

সুতরাং এই মাসে কুরআনের প্রতি বেশি মনোযোগী হতে হবে।

দীপু সম্মতি জানিয়ে মাথা নাড়ল। শহিদুল সাহেব বললেন, ইন্টারেস্টিং একটা তথ্য দিই তোমাকে। আমাদের নবিজি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে জিবরীল (আলাইহিস সালাম) রমাদান মাসে সম্পূর্ণ কুরআন শোনাতেন। জিবরীল (আলাইহিস সালাম) রমাদানে প্রতি রাতে নবিজির নিকট আসতেন। তিনি নবিজিকে পুরো কুরআন শোনাতেন এবং নবিজিও তাকে কুরআন কারীম শোনাতেন। নবিজি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ইস্তিকালের আগের রমাদানে জিবরীল (আলাইহিস সালাম) দু-বার নবিজিকে কুরআন শুনিয়েছিলেন। একটি হাদিস আছে বুখারিতে এই ব্যাপারে।^[১২] আর সবচেয়ে বড় ব্যাপার হলো, রমাদান মাসে আছে লাইলাতুল কদর। দীপু তুমি কী জানো, লাইলাতুল কদর কী?

দীপু ঘাড় নেড়ে বলল, সূরা কদর আমার মুখ্যত্ব আছে।

- অর্থ জানো?

দীপু না সূচক মাথা নাড়ল।

শহিদুল সাহেবের বললেন, কদর রজনী সহশ্র মাস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। সেই রজনীতে ফেরেশতাগণ ও কাহ অবতরণ করেন প্রত্যেক কাজে তাদের রবের অনুমতিক্রম। শাস্তিই শাস্তি, সেই রজনী সুবহে সাদিক উদিত হওয়া পর্যন্ত।^[১৩]

সুতরাং এই রাত রমাদানে খুঁজে নেওয়া দরকার। এবং এই রাতে সালাত, তাওবা-ইসতিগফার, দুআ-দরকুদ বেশি বেশি করা দরকার। আর বিশেষ করে রমাদানের শেষ দশ রাতে ইবাদাত বাড়িয়ে দেওয়া দরকার।

দীপু ভ্রকুধিত করে বলল, এর কারণ কী?

এর কারণ হলো, হাদিসের ভাষ্য অনুযায়ী,

কদরের রাত সুনির্দিষ্ট নয়। তবে রমাদানের শেষ দশকে তা হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। এ হিসেবে নবি ﷺ রমাদানের শেষ দশকে ইবাদাতের মাত্রা ও পরিমাণ বাড়িয়ে দিতেন। আশ্মাজান আয়শা সিদ্দীকা (রাদিয়াল্লাহু আনহার) নবিজির শেষ দশকের আমলের বিবরণ দিয়ে বলেন,

‘যামুন্নাই সালালাহু অব্যামারাম অন্য দিনগুলোর ছুলনায়
রমাদানের শেষ দশকে বেশি ইবাদাত
করতেন।’^[১৪]

তিনি আরও বলেন, ‘রমাদানের শেষ দশক শুরু হলে নবিজি পূর্ণবাহি জাগরণ করতেন। পরিবারের সবাটকে জাগিয়ে দিতেন এবং নিজে বেশি বেশি ইবাদাতের প্রস্তুতি নিতেন।’^[১৫]

[১৩] সূরা কদর, ১৭ : ৩-৫।

[১৪] মুসলিম, ১১৭৫।

[১৫] মুসলিম, ১১৭৪; বুখারি, ২০২৪।

[১১] সূরা বাকারা, ২ : ১৮৫।

[১২] বুখারি, ৪৯৯৮।

রমাদানের শেষ দশ দিনে একটি বিশেষ ইবাদাত আছে, যাকে বলে ইতিকাফ। এই সম্পর্কে কি তোমার কোনো ধারণা আছে?

শুনেছিলাম। মানুষজন মাসজিদে থাকে।

ঠিক শুনেছ। মাসজিদে শেষ দশ দিন থেকে একাগ্রচিত্তে আল্লাহর ইবাদাত করার মজাই কিন্তু আলাদা। এবং এতে লাইলাতুল কদর মিস হওয়ার সম্ভাবনা একদম কমে যায। রমাদানের ত্রিশ দিনের শেষ দশদিন অত্যন্ত তৎপর্যপূর্ণ। রমাদানের একটি বিশেষ আমল হচ্ছে সুন্নাত ইতিকাফ। রমাদানের খাইর-বরকত লাভে ইতিকাফের গুরুত্ব অপরিসীম। তাই নবিজি রমাদানের শেষ দশকে মাসজিদে ইতিকাফ করায বিশেষ গুরুত্ব দিতেন। এজন্য রমাদানের শেষ দশকে ইতিকাফ করা সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ কিফায়াহ। নবিজি প্রতি বছর অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে রমাদানের শেষ দশকে ইতিকাফ করতেন। আস্মাজান আয়িশা সিদ্দিকা (রদিয়াল্লাহু আনহা) বলেন,

**নবি<sup>সালাল্লাহু
সালাল্লাহু
ওয়াসালাম</sup> ঈতিকানের আগ পর্যন্ত রমাদানের
শেষ দশকে ঈতিকাফ করতেন। নবিজির পর
তাঁর স্ত্রীগণও ঈতিকাফ করতেন।^[১৬]**

আবু উবায়রা (রদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন,

**জিবীন প্রতি বছর নবি<sup>সালাল্লাহু
সালাল্লাহু
ওয়াসালাম</sup> -কে একবার
কুরআন শোনতেন। কিন্তু যে-বছর তাঁর
ওফাত ঘট, যে-বছর দুই বার শোনান। নবিজি
প্রতি বছর দশ দিন ঈতিকাফ করতেন। কিন্তু
ঈতিকানের বছর তিনি বিশ দিন ঈতিকাফ
করেন।^[১৭]**

[১৬] মুসলিম, ১১৭২; বুখারি, ২০২৬।

[১৭] বুখারি, ৪৯৯৮, ২০৪৪।

কথার এ পর্যায়ে আযান হতে শুরু করল। আসরের আযান পড়ে গেছে। শহিদুল সাহেবের কথা থামালেন। দীপু যোর লাগা চোখে তাকিয়ে ছিল শহিদুল সাহেবের দিকে। সেই যোর এখন কাটতে শুরু করেছে। শহিদুল সাহেব হাসি মাখা মুখে বললেন, কীভাবে সময় যায, দেখেছ! কথা বলতে বলতে আসরের আযান হয়ে গেল। তোমাকে চা-পানি কিছুই সাধা হলো না।

- ওগুলো লাগবে না, চাচা।

- অবশ্যই লাগবে। রহমত সাহেবের ছেলে আমার কাছে এসে একদম খালি মুখে যাবে, সেটা হতে পারে না। তবে চলো আগে মাসজিদে গিয়ে সালাত আদায করি, ফেরার পথে ভালো একটা রেস্টুরেন্টে বসে কিছু খেয়ে নেব।

এই কথা বলেই শহিদুল সাহেবের তার পাঞ্চাবির হাতা কাচাতে শুরু করলেন। ব্যস্ত ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়ালেন। হাসিমুখে বললেন,

- তুমি একটু বসো, আমি ওযু করে আসি। আমি আসলে তুমি ওযু করে নিয়ো।

- জি আচ্ছা।

শহিদুল সাহেবের উঠে ওযু করতে গেলেন।

ঘরে এখন দীপু একা বসে আছে। ফ্যানের বাতাসে টেবিলে পেপার ওয়েট দিয়ে চেপে রাখা টাকাগুলো উড়ে যেতে চাঁচে। একশ, পাঁচশ, হাজার টাকার অসংখ্য অগোছালো নোট। শহিদুল সাহেবে এখনো হিসেব করে রাখেননি। দীপুর মনে শয়তান কু-মন্ত্রনা দিতে শুরু করল। সে মনে মনে ভাবল, এখান থেকে মায়ের ওয়ুধের টাকাটা নিয়ে নিলে কেমন হয়? শহিদুল সাহেবের কাছে চাইলে তিনি হয়তো দু-একশ টাকা হাতে ধরিয়ে

দেবেন। দীপুর দরকার দু-হাজার টাকা। এখান থেকে যদি সে দুই হাজার টাকা সরিয়ে ফেলে, শহিদুল সাহেব বুঝতেও পারবেন না। আল্লাহ তো শহিদুল সাহেবকে অনেক দিয়েছেন, সুতরাং তার থেকে দু হাজার টাকা না-বলে নিলে এমন কী হবে। মুখ ফুটে যখন সে টাকার কথা বলতেই পারছে না। সেহেতু না-বলে নিয়ে গেলেই হয়। মা কে বাঁচাতে জীবনে না-হয় প্রথম এবং শেষ বাবের মতো চুরি করল সে।

দীপুর নিঃশ্঵াস ঘন হয়ে আসছে। কী সব চিন্তা করছে সে। টাকাটা তার খুব দরকার। তাই বলে চুরি করবে! দীপু আরেক নজর পেপার ওয়েটের নিচে চাপা পরে থাকা টাকাগুলোর দিকে তাকায়। সময় হাতে একদম নেই। যা করার এখনই করতে হবে। শহিদুল সাহেব ওয়ু শেষ করে যেকোনো সময় ঢলে আসবেন। দীপু হট করে পেপার ওয়েট তুলে এক হাজার টাকার দুটো নেট হাতে নিল। এরপর সময় নষ্ট না-করে বাড়ের গতিতে ঘর থেকে বের হয়ে এল। বাকি টাকাগুলো পেপার ওয়েটের ওজনের নিচে চাপা পরে রাইল আগের মতোই।

২

পরের দিন সকাল বেলা। শহিদুল সাহেব তার অফিস ঘরে বসে আছেন একা। হাতে বিশাল মোটা এক বই। তিনি মনোযোগ দিয়ে বইয়ের পাতা উলটাচ্ছেন। দীপু ধীর পায়ে দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে মাথা নিচু করে দাঁড়াল। শহিদুল সাহেব বই থেকে মাথা না-উঠিয়ে কর্কশ কঠে জিজেস করল, কী চাই?

দীপুর মুখ থেকে কোনো কথা বের হচ্ছে না। সে খুব নীরবে এক হাজার টাকার দুটো নেট শহিদুল সাহেবের সামনে রাখল। শহিদুল সাহেবের আড় চোখে দীপুর দিকে তাকিয়ে

জিজেস করলেন, কীসের টাকা? দীপু শান্ত গলায় বলল, গতকাল না-বলে নিয়েছিলাম।

সেটা জানি আমি। ফেরত দিচ্ছ কেন? দীপু মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল। কী বলবে সে?

শহিদুল সাহেব বেশ কিছুক্ষণ দীপুর দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর মমতা জড়ানো গলায় বললেন,

- দীপু!
- জি?
- টাকা চুরি করতে গেলে কেন?

দীপু মাথা নিচু করে রইল। তার চোখ বেয়ে পানি পড়ছে। লজ্জায় মাথা উঠিয়ে কথা বলার সাহস হারিয়ে ফেলেছে সে। তারপরও শত আড়ত্তা ভেঙে দীপু গতকালের ব্যাপারটা বলল।

শহিদুল সাহেব দীপুর কথা শুনে সোজা হয়ে বসলেন। মোটা বইটা বন্ধ করে দীপুর দিকে তাকিয়ে জিজেস করলেন, মায়ের ওয়ুধের টাকা কি অন্য কোথাও থেকে জোগাড় হয়েছে?

- জি না।
- তাহলে টাকাটা ফেরত দিচ্ছ মে?

চুরির টাকা হারাম। এই টাকা দিয়ে মায়ের ওয়ুধ কিনব না।

আমার কাছে না-চেয়ে চুরি করতে গেলে কেন? চুরি করা অনেক বড় গুনাহের কাজ, দীপু। তুমি যখন চুরি করছিলে তখন কেউ ছিল না, কিন্তু আল্লাহ ছিলেন। তিনি কিন্তু দেখেছেন।

দীপু কোনো কথা বলল না। চুপ করে রইল।
শহিদুল সাহেব বললেন, আমি চাইলে কি
তোমাকে দিতাম না? চাইতে কি লজ্জা লাগছিল
দীপু?

দীপু মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল। শহিদুল
সাহেবের কথার উত্তর দেওয়ার শক্তি তার নেই।
শহিদুল সাহেব বললেন, দীপু, এই দু-হাজার
টাকা আমি তোমাকে দিয়ে দিলাম। এটা তোমার।

দীপু এবার বড় বড় চোখ করে তাকায় শহিদুল
সাহেবের দিকে। শহিদুল সাহেব হাসিমাখা মুখে
বলেন, না না। এটা দান করছি না। তোমাকে
এই টাকাটা আমি ধার দিচ্ছি। এবং এই ধার
দেওয়ার শর্ত হলো, আমার দুই নাতিকে তুমি
পড়াবে, এবার আমার সাথে রমাদানের শেষ দশ
দিন মাসজিদে ইতিকাফে বসবে। এবং তোমার
পড়ালেখার পাশাপাশি আমার ব্যবসাতে সময়
দেবে। কি, পারবে না?

দীপু মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল, সে পারবে।

দীপুর চোখে আগেও পানি ছিল। লজ্জার,
অপমান এবং ঘানির পানি। এখন আবারও
আরেকবার দীপুর চোখ ভিজে উঠেছে। এবার
দীপুর চোখের পানির রং এক হলেও, এর স্বাদ
ভিন্ন। চোখের এই পানি শুন্দার, ভালোবাসার।
অন্ধকার থেকে আল্লাহর করণার দিকে ফিরে
আসার স্বচ্ছ, শুন্দ পানি।

‘যে ব্যক্তি দৈমান এবং ইহুত্তিসাব তথা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস
এবং সাওয়াবের প্রত্যাশা রেখে রমাদান মাসে সাওম রাখবে,
তার দুর্বের গুনাহগুম্বো মাফ করে দেওয়া হবে।’

সহীল বৃক্ষার্থ ৩৮



রমাদানের সুবাসে সুবাসিত হও!

আসাদুল্লাহ আল গালিব



আগুন গরম বিকেল। প্রথম রোদে মাথায় খই ফেটার মতো অবস্থা। হঠাৎ ধূলি উড়নো শীতল বাতাস। কিংবা এক পশলা ঝুম বৃষ্টি। ঘিরিবি঱ি বাতাসের পেলব ছোঁয়ায় এক অনাবিল প্রশান্তির ধারা বইতে শুরু করে হৃদয়-জগতে।

রমাদান ঠিক এরকমই একটা ব্যাপার। বছরের বাকি সময়টায় প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য, ছোট-বড় আর জানা-অজানা পাপের তাপে আমরা যখন হাঁপিয়ে উঠেছি, ঠিক তখনই হৃদয়ে প্রশান্তির স্নিগ্ধ পরশ বুলাতে হাজির হয়েছে ‘শাহুর রমাদান’। বছরের সেরা মাস।

রমাদানে আমরা নিজেদের গুনাহগুলো মাফ করিয়ে আঞ্চলিক সম্মতি অর্জনের সুবর্ণ সুযোগ পাই। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

‘যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে সাওয়াবের আশায় রমাদানে সাওম পালন করবে, তার পূর্ববর্তী সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেওয়া হবে।’^[১]

তাই রমাদানে আমাদের লক্ষ্য থাকবে—নিজেদের গুনাহ মাফ করিয়ে নেওয়া, নিজেকে পরিশুদ্ধ করা। আমাদের রমাদান যেন শ্রেফ কিছু আচার-অনুষ্ঠানের মাঝেই সীমাবদ্ধ না থাকে। ইফতার পার্টি আর সেহারি নাইট সেলিব্রেইট করতে করতেই যেন আমাদের রমাদান চলে না যায়। রমাদান নামের শীতল বাতাসে আমরা যেন নিজেদের প্রশান্ত করতে পারি। নিজেদের পাপের বোঝা হালকা করে, এক বিশুদ্ধ অন্তর নিয়ে অনন্ত সুখের জাহানে নিজেদের নাম লিখিয়ে নিতে পারি।

ভাইয়া এবং আপুরা, অগণিত ফয়লতের এই মাসে প্রত্যেকের উচিত নিজেদের সেরা আমল করা। সেজন্য পুরো মাসের জন্য একটি রুচির বানিয়ে নিতে পারো তোমরা।^[২]

প্রথমেই বলে নিই, নিজের ওপর প্রেসার নেবে না। এমন লক্ষ্য নির্ধারণ করবে না, যা তুমি করতে পারবে না। ধরো, তুমি ঠিক করলে প্রতিদিন তিন পারা করে কুরআন পড়বে। কিন্তু তোমার যে ব্যস্ততা, তাতে হয়তো দৈনিক এক পারা কুরআন পড়তে পারতো। এখন এই অতিরিক্ত লক্ষ্য পূরণের জন্য তোমার ওপর অনেক প্রেসার পড়বে। প্রথম কয়েকদিন হয়তো তুমি চাপ নিয়ে হলেও তিন পারা করে পড়তে পারবে। কিন্তু পরে একদিন মিস হয়ে গেলেই তোমার অলসতা চলে আসবে। অবচেতন মনেই তোমার অনাথ সৃষ্টি হবে—আমি তো পারছি না। তখন একেবারেই কুরআন পড়া হবে না।

আসলে আমরা অধিকাংশই এমন। লক্ষ্য নির্ধারণের সময় এমন টার্গেট ঠিক করি, যা আমাদের পক্ষে করা সম্ভব না। তাই, তোমার অবস্থা বুঝে লক্ষ্য নির্ধারণ করো। পরিমাণ কম হোক, কিন্তু তা যেন প্রতিদিন করতে পারো।

সালাতে হও অগ্রগামী

যদি বছরের অন্যান্য সময় তুমি সালাত না আদায় করো, তাহলে এ মাসে নিয়মিত সালাত আদায় করো। সালাতের দুআ ও ছোট ছোট সূরাগুলোর বাংলা অর্থ জেনে নাও। যদি তুমি অন্যান্য সময়েও পাঁচ ঘোন্স সালাত আদায় করে থাকো, তাহলে এ মাসে বেশি বেশি নফল সালাত আদায় করো। তারাবীহ পড়ো। তাহাজুদের সালাত

[১] বুখারি, ১৯০১; মুসলিম, ৭৬০।

[২] এই মাসে কী কী আমল করবে, তার একটি তালিকা দিচ্ছি আমরা। এটা অনুসরণ করলে সুন্দর একটি রমাদান কাটাতে পারবে ইনশাআল্লাহ—যোগো ভাইয়া।

আদায় করো। নফল সালাতের মধ্যে আল্লাহর কাছে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ হচ্ছে শেষ রাতের সালাত।^[৩] এটা হলো দুনিয়ার বুকে মুমিনের জন্য সবচেয়ে আনন্দায়ক মূহূর্ত। এটি দুনিয়া ও আখিরাতে বান্দার মর্যাদা বৃদ্ধি করে। তাই প্রতিদিন সাহরির কিছু আগে জেগে উঠো। কিছু সময় কিয়ামুল লাইল আদায় করো। ধীরস্থিরভাবে।

কুরআনকে বন্ধু বানাও

যদি তুমি কুরআন পড়তে না পারো, তাহলে এটাই সময়—শিখে নাও। যদি তুমি কুরআন পড়তে পারো, কিন্তু উচ্চারণ শুন্দ নয়, তাহলে উচ্চারণ শুন্দ করে নাও। আর এসবের পাশাপাশি প্রতিদিন কিছু সময় কুরআন পড়ো। চ্যালেঞ্জ নাও কুরআনের ছোট ছোট সূরা মুখ্যস্ত করার। আর যদি তুমি এসব আগে থেকেই পারো, তাহলে চেষ্টা করো রমাদানে পুরো এক খ্তম দিয়ে দিতে।

যিকরে সিন্ত করো তোমার জিহ্বা

যান্ত্রিক এই দুনিয়ায় অশাস্ত্রির শেষ নেই। দিনশেষে এক মুঠো প্রশাস্তির খুঁজে মরিয়া থাকি আমরা সবাই। প্রশাস্তি খুঁজে বেড়াই প্রেম-ভালোবাসা, গান, মুভি বা অন্যকিছুতে। অথচ প্রশাস্তি যেখানে পাওয়া যায়, সেই ব্যাপারে আমরা একেবারেই বেখেয়াল। আল্লাহ সুবহানাল্লাহ ওয়া তাআলা বলেন,

‘...জেনে রাখো, আল্লাহর স্মরণেই অন্তরসমূহ প্রশাস্ত হয়।’^[৪]

তুমি যদি আগে একেবারেই যিকর না করে থাকো, তাহলে এ মাসে প্রতিদিন ১০ বার সুবহানাল্লাহ (আল্লাহ পবিত্র), ১০ বার আলহামদুলিল্লাহ

(সব প্রশংসা আল্লাহর জন্য), ১০ বার আল্লাহ আকবার (আল্লাহ মহান) যিকর করো।

তোমার যদি আগেও যিকরের অভ্যাস থেকে থাকে, তাহলে ফরয সালাতের পর পঠিতব্য মাসনূল যিকর-আয়কার ও সকাল সন্ধ্যার ২৩ আয়কার মিস দিয়ো না। এগুলো সবই পাবে হিস্নুল মুসলিম বই বা অ্যাপো। আপ লিংক-
<https://tinyurl.com/2p8bt6r>

তুমি যদি আগে থেকেই এগুলোর ওপর আমল করে থাকো, তাহলে সহজ ১০টি যিকরের আমল করো। সহজ ১০টি যিকর সম্পর্কে জানতে ভিজিট করো এই লিংক-
<https://tinyurl.com/10zikr>

সীরাতকে করো অবসরের সঙ্গী

মুহাম্মাদ ﷺ -কে আমরা প্রাণের চাইতেও বেশি ভালোবাসি। তাঁর জন্য আমরা জীবনও দিয়ে দিতে পারি। কিন্তু আমাদের অনেকেরই তাঁর জীবনীটুকুও পড়া নেই। আমরা তাঁকে ভালোমতো চিনিই না। তাই এ মাসে চেষ্টা করো তাঁর জীবনী অধ্যায়ন করতো। প্রিয় নবিজির সীরাতকে করে নাও তোমার অবসরের সঙ্গী। পড়তে পারো ‘আর-রাহীকুল মাখতুম’। পিডিএফ লিংক -
<https://tinyurl.com/Sirahbook>

সেই সাথে শুনে ফেলতে পারো মুহাম্মাদ ﷺ-এর জীবনী নিয়ে সাজানো এই চমৎকার লেকচার সিরিজ- <https://tinyurl.com/seerah2022>

যদি আরও বেশি পড়তে চাও, তাহলে পড়ে ফেলতে পারো সাহাবিদের জীবনী নিয়ে চমৎকার চমৎকার বইগুলো।

[৩] মুসনাদু আহমাদ, ৮৫০৭, সুনানু দারিমী, ১৪৭৬।

[৪] সূরা রা�’দ, ১৩ : ২৮।

সাদাকাহ করো বেশি বেশি

অন্যান্য মাসের তুলনায় রমাদানে দান-সাদাকাহ বাড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করবে। প্রতিদিন অন্তত কিছু কিছু সাদাকাহ করার চেষ্টা করো। ৫ টাকা হোক সমস্যা নেই, কিন্তু প্রতিদিন দাও। আমল ছোট হলেও তা নিয়মিত করলে আল্লাহর তা পছন্দ করেন। যদি তোমার সামর্থ্য বেশি থাকে, তাহলে আরও বেশি টাকা দিতে পারো।

সাদাকাহ করার সময় ভয় পেয়ো না। সাদাকাহ সম্পদ করায় না; বরং তাতে বারাকাহ আনে এবং সম্পদ পিবিত্র করে। সাদাকাহ আল্লাহর ক্ষেত্রকে নিয়মিয়ে দেয়। নবিজি^[৫] অন্যান্য মাসের তুলনায় রমাদানে অনেক বেশি সাদাকাহ করতেন। তাই সামর্থ্য অনুযায়ী বেশি বেশি সাদাকাহ করো। মনে রেখো, এই মাসে যা-ই ইনভেস্ট করবে, আখিরাতে তা কয়েকশ গুণ হিসাবে পাবে।

গুনাহ থেকে বেঁচে থাকো

সব ধরনের গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার চেষ্টা করবে। বিশেষ কোনো গুনাহের অভ্যাস থাকলে এ মাসেই তা থেকে স্থায়ীভাবে তাওবা করে নাও। যেমন : নাটক-সিনেমা দেখা, অশ্লীল কিছু দেখা, গেইম-খেলায় আসন্ত থাকা, টিকটক-বিটিএস ফিল্মায় আক্রান্ত থাকা, গীবত ইত্যাদি। এ মাসে শয়তান বন্দি থাকে। তাই দৃঢ় প্রত্যয় গ্রহণ করো এসব থেকে মুক্তির জন্য। আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাও, সাহায্য চাও। তিনি আল-গাফুর, আল-গাফফার।

ভাইয়া/আপু,

দেখো, তোমরা অনেক কষ্ট করে সাওম রাখো। কিন্তু তোমাদের অনেকেই সাওমের সময়টা পার করো মুভি দেখে, গান শুনে বা একটার পর একটা টিকটক দেখে, অন্যের গীবত করো।

এগুলো যে সাওমকে হালকা করে দেয়, সেটা তো আর বলে দিতে হবে না, তুমি ভালোমতোই জানো। এখন দেখো, এমন আচরণ সম্পর্কে মুহাম্মদ^[৬] কী বলেছেন—

‘এমন অনেক সায়িম আছে, যার সাওম থেকে প্রাপ্তি হচ্ছে শুধু ক্ষুধা ও তৃষ্ণা। তেমনি কিছু মুসল্লি আছে যাদের সালাত কোনো সালাত-ই হচ্ছে না। শুধু যেন রাত জাগছে।’^[৭]

‘যে ব্যক্তি মিথ্যা-প্রতারণা ও গুনাহের কাজ ত্যাগ করে না, আল্লাহ তাআলার কাছে তার পানাহার থেকে বিরত থাকার কোনো মূল্য নেই।’^[৮]

তাহলে এবার একটু চিন্তা করে দেখো, তুমি শুধুই ক্ষুধার কষ্ট করবে কি না?

অনলাইনকে নির্বাসনে পাঠাও

রমাদানের প্রতিটি মুহূর্ত অনেক মূল্যবান। সময় নষ্ট করাটা অনেক বোকামি হবে। কিন্তু অনলাইনে আমাদের প্রতিদিন কত সময় নষ্ট হয়ে যায়, তাই না? রাতে ঘুমাতেও দেরী হয়। তাই চ্যালেঞ্জ নাও, অনলাইনে কাটানো সময় কমিয়ে দেবে এ মাসে।

আগে ২ ঘণ্টা ফোন ব্যবহার করলে এখন ১ ঘণ্টা করো। আগে ১ ঘণ্টা করলে এখন ৩০ মিনিট। আগে ৩০ মিনিট করলে এখন প্রয়োজন ছাড়া একবারও না।

দরকার হলে এ মাসে ইন্টারনেট প্যাকেজ নিয়ো না। আর ফোন ব্যবহার করার জন্য তোমার

[৫] মুসনাদু আহমাদ, ৯৬৮৫; সুনানু দারিমী, ২৭৬২।

[৬] বুখারি, ১৯০৩; সুনানু আবী দাউদ, ২৩৬২; তিরমিয়, ৭০৭।

মন আকুপাকু করতে পারে অনেক। এ জন্য সবচেয়ে ভালো হয় প্রয়োজন ছাড়া ফোন বন্ধ করে আশ্মু-আবু বা বড় ভাইবোনের কাছে জমা দিয়ে রাখলে।

আর যদি তুমি চ্যাম্পিয়ন হতে চাও, তাহলে অনলাইন থেকে একেবারেই নির্বাসন নাও। ফেসবুক, টিকটক, ফি ফায়ার—যা আছে সব আনইস্টেল করে দাও।

রাতে দ্রুত ঘুমিয়ে পড়ো

অনেকেরই একটা বাজে অভ্যাস দেখা দেয় রমাদানে। রাতে না ঘুমিয়ে একেবারে সাহরি থেয়ে ঘুমানো। এর ফলে শরীরের অনেক ক্ষতি হয়। তা ছাড়া রাত জেগে থাকার সময়টা মুভি, গান, সিরিয়াল বা বন্ধুদের সাথে অর্থহীন অনলাইন আড়ায় চলে যায়। রমাদান মাসেও খুব খারাপ গুনাহ হয়ে যায়। তাই তারাবীহ পড়েই দ্রুত ঘুমিয়ে যাও।

আয়ত্ত করো দুআর হাতিয়ার

দুআ সারাবছরই কবুল হয়। তবে রমাদানে দুআ কবুল হয় সবচেয়ে বেশি। আর আল্লাহর তো এমনিতেই তার বান্দাকে খালি হাতে ফিরিয়ে দিতে লজ্জাবোধ করেন।^[৭]

তাই দুআ কবুলের প্রতিগুলোতে বেশি বেশি দুআ করো। ফরয সালাতের পর, আযান ও ইকামাতের মাঝখানে, ইফতারের আগে ইত্যাদি সময়ে।

তবে দুআর জন্য সেরা প্রতির হলো শেষ রাত। শেষ রাতের দুআ এমন এক শক্তিশালী তিরের ন্যায়, যা কখনো লক্ষ্যভূট হয় না। প্রতিদিন

রাতের শেষভাগে আল্লাহ দুনিয়ার আসমানে নেমে আসেন। বান্দাদের উদ্দেশ্যে তিনি বলতে থাকেন,

‘কেউ কি আছে আমার কাছে কিছু চাইবে, আমি তাকে দেব। কেউ কি আছে আমার কাছে দুআ করবে, আমি তার দুআ কবুল করব। কেউ কি আছে আমার কাছে ক্ষমা চাইবে, আমি তাকে ক্ষমা করে দেব।’^[৮]

এভাবে ফজর পর্যন্ত তিনি বলতেই থাকেন। তাই ওই সময়ে বেশি বেশি দুআ করো। নিজের জন্য, পরিবারের জন্য, আল্লায়-স্বজন, বক্র-বান্ধব সবার জন্যই দুআ করো। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রাণ্তে যুলুমের শিকার মুসলিম ভাইবোনদের জন্যও দুআ করো।

ছেট একটা টিপস দিই এই ফাঁকে, ৩০ দিনের জন্য ৩০টি দুআর লিস্ট বানিয়ে ফেলো। অন্যান্য দুআর পাশাপাশি ঐ দিনের জন্য নির্দিষ্ট দুআ বেশি করে করলো। এর ফলে আল্লাহর কাছে কিছু চাইতে ভুলে গেলাম—এই ঝাঁকি আর থাকে না, লিস্ট করাই আছে। ও হ্যাঁ, আমাদের যোলো টিমের জন্য দুআ করতে ভুলে যেয়ো না যেন—আল্লাহ যেন আমাদের সর্বোত্তম রিয়ক দান করেন, দ্বিনের জন্য কবুল করে নেন।

পরিবারের কাজে সহযোগিতা করো

অনেকেই ভাবে, শুধু সালাত, সাওম আর তিলাওয়াত-ই দ্বীন। পরিবারের খিদমাত করা, তাদের সাথে সদাচার করা মনে হয় দ্বিনের কিছু না। এটি পুরোপুরি ভুল ধারণা।

[৭] তিরমিয়ি, ৩৮৭২; সুনানু আবী দাউদ, ১৪৮৮; সহীহ ইবনু ইব্রাহিম, ৮৭৬।

[৮] মুসলিম, ৭৫৮; মুসনাদু আহমাদ, ৭৫০৯।

নবিজি ৰ তো বলেই দিয়েছেন,
‘তোমাদের মধ্যে সে-ই উত্তম, যে তার
পরিবারের কাছে উত্তম।’^[১]

তাই ভাইয়া এবং আপুরা, পরিবারের সদস্যদের
প্রতি রহম-দিল হও। রমাদানের বরকতময়
দিনগুলোতে যথাসাধ্য তাদের খিদমাত করো।
ঘরের কাজে, রান্নার কাজে মাকে সাহায্য করো।
বাজারের কাজে বাবাকে সাহায্য করো। ঘরের
কাজে সাহায্য করা নবিজি ৰ-এর সুন্নাহ।
মর্যাদাপূর্ণ কাজ। তাহলে তোমরা পিছিয়ে থাকবে
কেন?

ইফতার হোক সাদামাটা

একটা বাজে কালচার তৈরি হয়েছে আমাদের
সমাজে। ইফতারিতে বাহারি আইটেম না-
থাকলে মন ভরে না। ভাবখানা এমন—সারাদিন
কিছু খাইনি, এখন শুধু খাইতেই হবে আর
খাইতেই হবে! এটা কি সাওমের শিক্ষা? সাওম
তো আমাদের সংযমী হতে শেখায়। কথাবার্তা,
চালচলন, খাওয়াদাওয়া সবক্ষেত্রে।

বাহারি আইটেমের ইফতার তৈরিতে আমরা
নফসের গোলামি আর টাকা অপচয় করা ছাড়া
কিছুই করি না। আবার ঘরে এত এত আইটেমের
ইফতার তৈরি করতে গিয়ে দিনের বড় একটা
অংশ রান্নাবান্নাতেই কেটে যায় মাঝেদের।
ইবাদাতের জন্য সময় বের করতে হিমশিম খান
তারা।

রমাদান বেশি বেশি আমলের মাস। বেশি বেশি
খাওয়ার মাস না। নফসের চাহিদা মেটাতে গিয়ে
মা-বোনদের ইবাদাত থেকে বঞ্চিত করা উচিত
নয়। তাই ইফতার হোক সাদামাটা, আমল হোক
বেশি বেশি। চাইলে ইফতারের বাহারি আইটেমের

[১] তিরিমিয়ি, ৩৮৯৫, সহীহ ইবনু হিব্রান, ৪১৭৭।

খরচ বাঁচিয়ে সে টাকা কোনো অসহায় সায়িমকে
(রোয়াদারকে) দান করতে পারো।

নবি ৰ বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি কোনো সায়িমকে
ইফতার করাবে, সে তার সমপরিমাণ সাওয়াব
পাবে; সায়িমের সাওয়াব থেকে একটুও কমানো
হবে না।’^[১০]

শেষের দশে থাকো শীর্ষে

রমাদানের প্রত্যেকটা দিনই বরকতময়। এর
মধ্যে শেষের দশদিনের রাতগুলো সবচেয়ে
বেশি বরকতময়। এ সময় নবিজি ৰ ইবাদাতের
জন্য কোমর বেঁধে নামতেন।^[১১] এই শেষ ১০
দিন চেষ্টা করবে একটু বেশি আমল করতে। যদি
সন্তুষ্ট হয় অনলাইন থেকে একেবারেই বিদায়
নেবে। আর যদি তুমি আরও বেশি আমল করতে
চাও, তাহলে মাসজিদে (ছেলেদের জন্য)
ইতিকাফে বসতে পারো।

সহশ্র মাসের চেয়েও সেরা রাতের আবিদ হও

রমাদানে রয়েছে এমন এক বরকতময় রাত, যা
সহশ্র মাস অপেক্ষা উত্তম। তা হলো, লাইলাতুল
কদর। কুরআন নাযিলের রাত। এই রাতের
ইবাদাতে বান্দাকে মাফ করে দেন মহিমাময়
আল্লাহ। নবিজি ৰ বলেছেন,

‘যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে এবং
সাওয়াবের আশায় লাইলাতুল কদরে
সালাত আদায় করবে, তার গুনাহসমূহ
মাফ করে দেওয়া হবে।’^[১২]

[১০] তিরিমিয়ি, ৮০৭; ইবনু মাজাহ, ১৭৪৬; মুসনাদু
আহমাদ, ১৭০৩।

[১১] বুখারি, ২০২৪।

[১২] বুখারি, ২০১৪; মুসলিম, ৭৫৯।

তাই সহশ্র মাসের চেয়েও সেরা এই রাতের আবিদ হও। জীবনের সেরা আমল করো এই রাতে। লাইলাতুল কদর পাওয়ার জন্য শেষ দশদিনের প্রতিটি রাতই ইবাদাত করো; বিশেষ করে বেজোড় রাতগুলোতে।^[১৩] শুধু সাতশ তারিখের

অপেক্ষায় থেকে অন্যান্য রাতে গাফলতি করো না। কেননা, লাইলাতুল কদর শেষ দশদিনের যেকোনো রাতেই হতে পারে। যে রাত হাজার মাসের চাইতেও দার্মা, এমন মহান রাত পাওয়ার জন্য একমাস জাগতে হলো স্টেটও তো কম হয়ে যায়। তাই এর জন্য দশ রাত জাগাকে কঠিন ভেবো না। লাইলাতুল কদরের কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হোয়ো না।

‘যে ব্যক্তি এর কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হলো, সে মূলত সকল কল্যাণ থেকেই বঞ্চিত হলো।’^[১৪]

সব রাতেই বেশি বেশি আমল না করতে পারলেও অল্প করে কিছু কিছু আমল করো। যেমন- দু রাকাত সালাত আদায় করা, ১০ টাকা দান করা, ১ পৃষ্ঠা কুরআন পড়া। তাহলেও ইনশাআল্লাহ, বিপুল সাওয়াব লাভ করবে।

বিদায়ের আগে

রমাদানের শেষ দিকে ঈদের কেনাকাটায় অপচয় থেকে বেঁচে থাকবে। তুমি যদি আগে দুইটি পোষাক কিনতে, এবার একটা কেনো। আর একটার টাকা কোনো অভাবীকে দান করে দাও। মার্কেটে গেলে নজরের হিফায়ত করা প্রায় অসাধ্য ব্যাপার হয়ে যায়। পারলে রমাদানের

আগেই কেনাকাটা সেরে ফেলো।

রমাদান শেষ হওয়ার আগে নিজেই নিজের হিসেব নাও। জানাতের পথে কতটুকু এগিয়ে গেলে আর জানাতের পথের প্রতিবন্ধকগুলোর কী কী তোমার মধ্যে রয়ে গেছে, এগুলোর একটা লিস্ট করো। কোনো মুসলিমের প্রতি মনের কোণে ঘৃণা বা বিদ্যেষ থাকলে তা মুছে ফেলো। ভুলটা তাদের হলেও তুমি তাকে ক্ষমা করে দাও। আল্লাহও তোমাকে ক্ষমা করে দেবেন এবং তোমার মর্যাদা বাড়িয়ে দেবেন। সবাইকে মাফ করে দিয়ে একটা ফ্রেশ, পরিচ্ছন্ন অন্তর নিয়ে রমাদান শেষ করো।

আল্লাহ সুবহানাল্ল ওয়া তাআলা আমাদের সবাইকে রমাদানে ও রমাদানের বাহিরে অধিক পরিমাণে সাওয়াবের কাজ করার এবং তাঁর দ্বিনের ওপর অবিচল থাকার তাওফিক দান করছন। আমীন।

[১৩] বৃখারি, ২০১৭; মুসলিম, ১১৬৯।

[১৪] নাসাই, ২১০৬; ইবনু আবী শাইবা, আল-মুসামাফ, ৮১৫৯; মুসনাদু আহমাদ, ৭১৪৮।



সাওম যেভাবে তোমাকে সুস্থিতা উপহার দেবে

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি



সাওম রাখলে পুরোনো অতিগত কোষ গুলো এখন হয়ে যায়।
সেখানে জ্ঞান নেয়া নতুন কোষ। যা তে মার রোগ প্রতিরোধ
ক্ষমতা বাড়িয়ে দেয়।

হৃদপিণ্ডের সুস্থিতা



রক্তচাপ স্বাভাবিক করে ইইপারটেনশন দূর করে সাওম। রাতের
কোলাস্টেরলের মাঝাও নিয়ন্ত্রণে রাখে। মনে রাখবে হৃদপিণ্ডের
রোগে আতঙ্গ হয়েই বিশ্বে সর্বাধিক মানুষের মৃত্যু ঘটে।

মস্তিষ্কের সুস্থিতা



যায়কে শক্তিশালী করে সাওম। মনোমোগ বৃদ্ধি ও দীর্ঘ সময়
মনোমোগ ধরে রাখতে সাহায্য করে। ২ ঘন্টার পড়া ১
ঘন্টাতেই হয়ে যাবে বুরাতে পারছে তো?

প্রদাহ দূর করে



এটি প্রদাহজনিত রোগ এবং আগার্জি সারাতে সহায়তা করে।
দীর্ঘদিনের বাধা, বাত ব্যথা ইত্যাদি সরিয়ে তোলে।

শরীরকে ডিটক্স করে



পরিবেশ দূষণ, খাবার, ঔষধ ইত্যাদির কারণে শরীরে অনেক
বিষাক্ত পদার্থ জায় থাকে। সাওম শরীর থেকে এসব বিষাক্ত
পদার্থ বের করে দেয়।

এ ছাড়াও উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবেটিস এর মতো প্রশংসাতী রোগের বিরুদ্ধে সুরক্ষা দেয় সাওম। তো
তাহলে সাওম রাখলে তুমি অস্থ হয়ে পড়ার এই চিন্তা মাথা থেকে খেড়ে ফেলো। চালেঙ্গ নাও
এবার তুমি সবগুলো সাওম রাখবে!

তোমরা অনেকেই
সাওম রাখতে ভয়
পাও। ভাবো
শুকিয়ে কাঠ হয়ে
যাব। শরীর নষ্ট
হয়ে যাবে। ভেঙ্গে
পড়বে স্বাস্থ্য।
কিন্তু তোমরা কি
জানো, রমাদান
তোমাকে
শারীরিক ভাবে
প্রচুর শক্তিশালী
করে তুলবে?



চ্যালেঞ্জ- একটি সাওমও মিস হবে না এবার ইনশাআল্লাহ!



‘...আমার নাম সোহান। ঐ বাজারের পাশে আমি থাকি। আর আমার বাড়ি সুনামগঞ্জ। আমার একটা ছোট বোন আছে। একটা ছোট ভাইও ছিল। আর ছিল বাবা-মারে নিয়া সুখের পরিবার। আমাদের গোলা ভরা ধান, পুরু ভরা মাছ ছিলো। গ্রামের স্কুলে জেএসসি-তে ভালো পশ্চ কইরা আমি ক্লাস নাইনে ছিলাম। প্রত্যেকবারই আমাদের গ্রামে বন্যা হয়।

কিন্তু গতবারের বন্যায় আমার জীবন পাল্টাইয়া গেছে। ঠিক কইরা ধানগুলা পাকার আগেই বন্যা হইয়া সব নষ্ট হইয়া গেছে। গরু-ছাগল রোগে মারা গেল। শুরু হইলো পরিবাবের অভাব-অন্টন। তিনি বেলা ঠিক মতো খাইতে কষ্ট হইয়া যায়। তারপরেও এই নিয়া দিন ভালোই কাটিতাছিলো। কিন্তু এক রাইতে তখনও আববা ঘরে ফিরে নাই। সেই রাইতে শুরু হয় বিরাট বাড়। আমাগো টিনের ঘরটায় আমি, আমার বোন, মা আর আমার ছোটভাই একলগেই ছিলাম। ঘড়ে রান্না ঘর উইঢ়া আমাগো ঘরের উপরে পড়ে। ছোট বোনটারে হাতে ধইরা আমি বাইরাইয়া গেলাম। কিন্তু মা ছোট ভাইটারে নিয়া বাইরাইতে পারলো না। দুনিয়া থেইকা মাও চিলা গেল। আদৰ কৰার মত আর খালি আববা থাকল। গ্রামের চারদিকে মানুষের খালি

অভাব আৰ অভাব। তাই আববা আমাগোৱে লইয়া শহরে আইয়া পড়ল। আববা একটা রিক্সা ভাড়া লইয়া চালায়। আর আমি এই বাজারে চায়ের দোকানে কাজ কৰি। ঘরের রান্না আৰ বইনেৰ দেখাশুনা কৰি আমি। তাই আমার পড়ালেখা এখন বন্ধ।’

সোহানেৰ কথা গুলো শুনে চোখেৰ কিনারায় পানি চলে আসল। কত কষ্টেৰ জীবন ওৱ। আবাৰ জিজ্ঞেস কৰলাম, এবাৰ রোজা কিভাৱে কাটালে? ও বলল, ‘রোজা তো যুটামুটি কাটাইছি। মাৰো এমনও দিন গেছে পানি খাইয়া রোজা রাখছি আবাৰ পানি দিয়াই ইফতারি কৰছি’ কথা শুনে বিবেক নাড়া দিয়ে উঠল। কষ্টেৰ কালো মেঘ মনে গিয়ে পাড়ি জমালো।

অন্যদিকে, কাল ঈদ। এজন্য বাজারেৰ ছেলেৱা আনন্দে মেতে উঠেছে। ডেক সেটে গান বাজিয়ে নাচানাচি কৰছে। আবাৰ আতশবাজি, চকলেট বোমা ফাটিয়ে আশেপাশেৰ মানুষদেৱ চৰম বিৱৰণিৰ উদ্বেক কৰছে। দেখতে দেখতে মনে মনে ভাৰলাম সোহানেৰ মতো কত ছেলে-মেয়ে ঈদে আনন্দ কৰতে পাৰছে না। এটা আমৰা ক’জনইবা ভেবেছি? এজন্য মনেমনে সিন্ধান্ত নিলাম আৰ কিছু না পাৰি অস্তত নিজেৰ এলাকার গরিব ছেলেগুলোৰ সাথে আনন্দ ভাগাভাগি কৰে এবাৰ ঈদ কাটাব।

ডাক্তারখানা

বেঙ্গল হাসপাতাল চৰকৃতি:

লসট মডেল



ক্লাস নাহিনে পড়ি। স্যার ফিজিঙ্গ ক্লাসে নিউটনের গতির তৃতীয় সূত্র বোঝাচ্ছেন- প্রত্যেক ক্রিয়ারই একটি সমান ও বিপরীত প্রতিক্রিয়া আছে। স্যার বললেন এটা সবাই মুখ্যস্ত করে নে। এটা বাস্তব জীবনেও হয়। তুই কারও ক্ষতি করলে তোরও একদিন ক্ষতির সম্মুখীন হতে হবে। তবে তোদের ক্লাসে একজন আছে যার ক্ষেত্রে অবশ্য এই সূত্র কাজ করবে না। এইচুকু বলে স্যার থেমে গেলেন। মিটিভিটি হাসছেন।

আমাদের সবার মনে কৌতুহল। কে সেই ব্যক্তি। অবশ্যে স্যার নীরবতা ভঙ্গ করে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন - এই তুই দাঁড়া। আমি দাঁড়ালে ক্লাসের সবাইকে দেখিয়ে স্যার বললেন- এই সেই গুণধর যার ক্ষেত্রে এই সূত্র প্রযোজ্য নয়।

সবাই সমন্বয়ে জানতে চাইল - স্যার, কেন কেন? সৈকত তো পাশ থেকে ফোড়ল কাটল- আরে ও তো ভিনগ্রহ থেকে এসেছে, দেখছিস না কেমন এলিয়েনের মতো চেহারা!

পাজির পা ঝাড়া সৈকত। রোজ রোজ আমার টিফিনের ২ টা রুটি আর ডিম তোকে খাওয়াই। তুই আমার সাথে এমন করছিস। দাঁড়া, ক্লাসটা শেষ হয়ে নিক।

স্যার ট্রাফিক পুলিশের মতো হাত তুলে ক্লাস শান্ত করলেন। এরপর বোর্ডে কিছু ছবি আঁকতে থাকলেন। স্যার সচিত্র বর্ণনা দিয়ে গেলেন পরের ৫ মিনিট আর লজ্জায় আমার কান গরম হতে থাকল।

‘এই যে এইটা দেখছিস এ হলো তোদের নাফিস মিয়া, আর এই যে এ হলো নাফিস মিয়ার বউ। দু’জন বিকেলে বাতাস থেতে নদীর ধারে গেছে। আর এই যে দুজন... এরা হলো ছিনতাইকারী। এরা এসে নাফিসের বউয়ের গলায় ছুরি ধরে বলছে সোনাদানা, টাকাপয়সা যা আছে দে। না হলে গলা নামিয়ে দেব।

এই কাজটা কি বলতো নিউটনের গতির ভাষায়?’—স্যার প্রশ্ন করলেন।

স্লোগান দেবার মতো সবাই বলে উঠল- ক্রিয়া! স্যারও স্লোগান দেবার সুরে বলল- রাইট!

‘এখন নিউটন বাবাজির কথা মতো বিপরীত প্রতিক্রিয়া দেখানোর কথা নাফিস মিয়ার। কিন্তু সে কী করবে? সে বউ ফেলে ভয়ে দিবে দৌড়। ওর গায়ে দু ছাঁটাক মাংসও নাই। ও কীভাবে ফাইট দেবে?’

পুরো ক্লাসে হাসির রোল পড়ে গেলো। স্যার, আমার দিকে তাকিয়ে বলল- ইয়ৎ ম্যান, প্রো সাম মাসল! আমি মাথা নিচু করে বসে পড়লাম। এক সময় আমার ওজন ছিল ৪৭/৪৮ কেজি। তালপাতার সেপাই ছিল আমার ডাকনাম। একটু বাতাস উঠলেই সবাই আমাকে নিয়ে ঠাট্টা করত- এই বাইরে যাস না, বাতাসে কিন্তু উড়ে যাবি! শুক্রবারে জুবু পরে নামায পড়তে গেলে দুষ্ট পোলাপান আমাকে বলত- ঐ যে দেখ কাকতাডুয়া যায়!!

শুকনা শরীরটা নিয়ে মনে তানেক কষ্ট ছিন। কী আর করবো বনো রোজ রোজ এতো ঠাট্টা হজম করা যায়?

তবে শুকনা থাকার ফলে একবার আমি আর আমার এক বন্ধু বেশ বড় ধরনের একটা এক্সিডেন্ট থেকে বেঁচে গেলাম। কলেজ থেকে হোস্টেলে ফিরছি। রাস্তা পার হবার সময় আমি আর আমার বন্ধু দুই বাসের টিপায় পড়ে গেলাম। তারপর যদি সোজা থাকতাম তাহলেও টিপায় পড়ে চ্যাপ্টা হয়ে যেতাম। দুইজনে বাঁকা হয়ে গেলাম আড়াআড়ি ভাবে। শরীর যেম্বে বাস চলে গেল। একটু মোটা হলেই সেদিন দুইজনেই মারা যেতাম। শুকনা থাকার কারণে দৌড়ে সহজে কেউ পারত না, মোটা বন্ধুদের তুলনায় খেলাধুলায় বেশ ভালোই ছিলাম, গরমে হাসফাঁস

কম করতাম।

ভাস্তিতে থাকতে একবার জ্বর হলো। ওজন আরও কমে গেল। বন্ধুরা আরও পচাতে লাগল। এরপর কি যে মনে হলো একমাস গোগ্রাসে খেলাম। রাত ১০টার মধ্যে ঘুমিয়ে ফজরের সময় উঠলাম, রিলাক্স থাকলাম, দুশ্চিন্তা-টেনশন থেকে দূরে থাকলাম। এক মাসের মাথায় ওজন বাড়ল ৬ কেজি। দেড় মাস পর যখন হল থেকে বাসায় গেলাম তখন আমার ওজন ৬১ কেজি ছাঁই ছাঁই। মায়ের মুখে হাসি আর ধরে না। জীবনে এই প্রথমবারের মতো বাসায় ফেরার পর মা বলল না যে, তুই শুকিয়ে কক্ষাল হয়ে গিয়েছিস। মানুষজন আমাকে এসে জিজ্ঞাসা করল, এই তুমি কী খাইছো? কেমনে এতো মোটা হইলা? ওযুধ খাইছ নাকি? এরপর ওজন বাড়া-কমা, বাড়া-কমার মধ্য দিয়ে যেতে যেতে এখন ভাঁড়ি কীভাবে কমানো যায় তা জানতে রোজ রোজ গুগল সার্চ করিব!!

শরীর শুকনা, কেন মোটা হচ্ছি না এসব ভেবে, তান্মাতার সেপাই, কাঠি, ঘ্যাপার, বাতাস উঠন্মে পড়ে যাবি সাবধান— এসব কথা শুনে হয়ত তোমার মন খারাপ হয়। বন্ধুদের মতো টি-শার্ট পরে মাসল দেখিয়ে

বেড়াতে পারো না, মেয়েদের চোখে হিরো সাজতে পারো না এসব ভেবে হয়ত তোমার হতাশা আসে। হতাশা থেকে অনেকেই হীনশূল্যতায় ভোগো। মানুষজনের সামনে সহজ হতে পারো না। মিশতে পারো না। নিজেকে গুটিয়ে নাও।

আসো দুইজন সুপার হিরোর গল্প শোনা যাক।

প্রথমজন হলেন এমন একজন যিনি এই দুনিয়ার বুকে নবি, রাসূলের (আ.) পর যতো মানুষ হেঁটে বেড়িয়েছেন তাঁদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। দুনিয়াতেই জান্মাতের সুসংবাদ পেয়েছেন। সাত আসমানের ওপর থেকে আল্লাহ তাআলা যাকে সালাম পাঠিয়েছেন। তিনি ছিলেন মুহাম্মাদ ﷺ এর সবসময়ের সঙ্গী, ইসলামের প্রথম খলিফা। আল্লাহর রাসূল ﷺ মৃত্যুর পরে সবাই যখন কিংকর্তব্যবিন্মৃত হয়ে পড়েছিলেন, উমার ইবনু খাব্তাবের (রা.) মতো মহাবীর, প্রবল ব্যক্তিত্বের অধিকারী মানুষও শিশুর মতো আচরণ করছিলেন তখন একা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন এই সুপার হিরো। তিনি আবু বকর রাদিআল্লাহু আনন্দ।

আলি ইবনু আবি তালিব (রা.) এমন সাহসী, এমন দুর্ব্য যোদ্ধা ছিলেন, এমন এক পর্বতসমান ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন যে শক্ররা তাঁর নাম শুনলেই ভয়ে কঁপতো। তিনিই হলেন সেই ব্যক্তি যিনি খাইবারের যুদ্ধে দুর্গের দরজাকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করেন, যেটা যুদ্ধের পরে ৭০ জন মানুষ মিলেও তুলতে পারেনি। এই আলি (রা.) একদিন মানুষদের জিজ্ঞাসা করলেন, বলো তো সবচাইতে কে বেশি সাহসী? উত্তর এলো— আপনি, আপনি সবচেয়ে বেশি শক্তিশালী হে আবুল হাসান (আলি রা.)’। আলি (রা.) বললেন না, কক্ষনো না। আমি কোনো দন্দযুদ্ধে পরাজিত হইনি, কিন্তু তারপরেও আবু বকর (রা.) আমার চাইতেও অনেক অনেক সাহসী। তিনি সবচেয়ে বেশি সাহসী।^[১]

আলি (রা.) বললেন, বদরের যুদ্ধে একটি কমান্ড সেন্টার স্থাপন করা হল। যেখান থেকে রাসূলুল্লাহ ﷺ যুদ্ধ পরিচালনা করবেন। সেই

[১] Bravest From Amongst Them - Abu Bakr As Saddiq (RA)- <https://tinyurl.com/mrekmm2c>

তাবুর নিরাপত্তা প্রদানের জন্য ভলান্টিয়ার চাওয়া হলো। আমাদের কেউই এগিয়ে গেল না। এগিয়ে গেলেন কেবল আবু বকর (রা।)। তরবারি হাতে তিনি আল্লাহ'র রাসূলের (সা।) তাঁবু পাহারা দিছিলেন। বিশ্বাস করো, তাঁর মতো সাহসী আমি কাউকেই দেখিনি'।^[২]

সুবহানআল্লাহ! একবার চিন্তা করো, **আমির** (রা।) মতো মানুষ, সার্টিফিকেট দিচ্ছেন আবু বকর (রা।) এর মতো সাহসী মানুষ তিনি আর দেখেননি।

এই পর্যন্ত পড়ার পর এবার আবু বকর (রা।) এর শারীরিক গঠনের কথা চিন্তা করো। কেমন ছিলেন তিনি ? অনেক লম্বা, মাসলের হাত-বাজার বিসিয়ে ফেলা এমন একজন কেউ? উত্তর একটু পরে দিচ্ছি।

আমাদের আবেকজন সুপারহিরো হলেন আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রা।)। কুরআনে তাঁর ছিল অগাধ পাণ্ডিত্য। একবারে তাঁর কুরআন তিলাওয়াত শুনে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) মন্তব্য করেন- কুরআন যেরকম সরস ও প্রাণবন্ত রূপে নাযিল হয়েছে, ঠিক সেরকম পড়ে যদি কেউ আনন্দ পেতে চায়, তাহলে তার উচিত ইবনু উম্মু আবদ অর্থাৎ আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদের কিরাওতে তা পড়।'

আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রা।) শুধুই কেবল একজন কুরআনের শ্রেষ্ঠ বিশুদ্ধ তিলাওয়াতকারী, কুরআনের পণ্ডিত, আবিদ ছিলেন না, তিনি ছিলেন শক্তিশালী, আঘ্যপ্রত্যয়ী এবং যুদ্ধের ময়দানের একদম সামনের সারিয়ে মুজাহিদ। বিলাল (রা।) এর ওপর সর্বাধিক অত্যাচারকারী উমাইয়া ইবনু খালাফকে বদরের

যুদ্ধে জাহানামের টিকিট ধরিয়ে দিয়েছিলেন তিনি।

তাঁর সাহসিকতা, তাঁর বীরত্বের উদাহরণ হিসেবে এটা বলাই যথেষ্ট যে, তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ মুসলিম যিনি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর পর পৃথিবীর বুকে উচ্চ আওয়াজে কুরআন পড়েন।

সেই সময় মক্কার কুরাইশদের অত্যাচারের মুখে সাহাবিদের (রা।) পক্ষে উচ্চ আওয়াজে কুরআন পড়ে কুরাইশদের শোনানো সন্তুষ্ট ছিল না। আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রা।) বললেন, আমিই তাদের উচ্চ আওয়াজে কুরআন পড়ে শোনাবো।

সকলে হায় হায় করে উঠলেন, ‘আপনার ব্যাপারে আমরা ভরসা পাই না। আমাদের প্রয়োজন এমন একজন মানুষ- যার বৎশ বড় এবং জনবলও বেশি। যারা তাঁর হেফায়ত করবে এবং কুরাইশের ক্ষতি থেকে তাকে সুরক্ষা দেবে।’

তিনি উনাদের কথা না শুনে কাবা শরীফে গিয়ে উচ্চকঠো সূরা আর-রাহমান তিলাওয়াত করা শুরু করেন- আর রাহমান, আল্লামাল কুরআন...

কুরাইশরা স্তুত হয়ে গেলো! এই পুঁচকে রাখান্নের সাহস কতো বড়! দে মাইর দে। সবাই মিলে আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদকে (রা।) অনেক পেটালো। রক্তে রঞ্জিত করে ফেলল। কিন্তু তিনি মার খেতে খেতেও তিলাওয়াত অব্যাহত রাখেন। তিলাওয়াত শেষে বক্তৃতা অবস্থায় সাহাবিদের মাঝে ফেরত আসেন। সাহাবিরা তাঁর এ অবস্থা দেখে বললেন- এটাই আমরা আশঙ্কা করছিলাম।

তিনি বললেন, আল্লাহর কসম! এই মুহূর্তে আল্লাহর দুশ্মনরা আমার চোখে এত পরিমাণ তুচ্ছ যে এর আগে তারা এতো তুচ্ছ ছিল না।

[২] The Biography of Abu Bakar As-Siddeeque-
<https://tinyurl.com/vfacnv3m>

আপনারা চাইলে আমি আবার আগামীকাল
একই কাজ করব'।^[৩]

**এই মর্দে মুজাহিদ আবদুল্লাহ ইবনু
মাসউদ (রা.) কেমন ছিলেন? পানোয়ান?
মাসনম্যান?**

আমাদের প্রথম সুপারহিরো আবু বকর (রা.)
এর কাছে ফেরত যাওয়া যাক। কেমন ছিল তাঁর
শারীরিক গঠন? তাঁর মেয়ে আশ্মাজান আঙ্গুশা
(রা.) আমাদের জানাচ্ছেন- ‘আমার বাবা
ছিলেন খুবই শুকনা। এতোই শুকনা যে তাঁর
কোমরে পায়জামা ঠিকমতো থাকত না। পড়ে
যেত খানিক পরপর। তাঁর চোখগুলো ছিল গর্তে
বসা। তিনি যেন বাতাসে ভেসে ভেসে হাঁটতেন।
এতোটাই শুকনো ছিলেন তিনি।’ রাদিয়াল্লাহ
আনহু।^[৪]

আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রা.) ছিলেন অনেক
শুকনো। একবার তিনি খেজুরের গাছে
উঠছিলেন। তাঁর সরু সরু কাঠির মতো পা
দেখে অনেকেই হাসাহাসি শুরু করে দিলেন।
রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তখন ঐ সাহাবিদের বললেন,
‘তোমরা কেন এমন করছো? তোমরা কেন
হাসছো? কসম সেই সন্তার যার হাতে আমার
প্রাণ, আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদের পা যদি
মিজানের পাল্লায় ওজন করা হয় তাহলে তা
উভদ পাহাড়ের চাইতেও বেশি ভারি হবে।^[৫]

ভাই আসল কনফিডেন্স, আসল শক্তি মাসল
দিয়ে আসে না, আসে আল্লাহর ভয়, আল্লাহকে
চিনতে পারা, তাওহীদকে বুঝতে পারার মাধ্যমে।
মেয়েদের ক্রাশ হওয়া, মেয়েদের সাথে ‘রঙচঙ্গ’
করার মধ্যে পুরুষ হবার কিছু নাই, পুরুষ তো

তাঁরাই যারা ফজরের সালাতে ঘুম থেকে উঠতে
পারে, রাগ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, বাবা-মার
সাথে ভালো ব্যবহার করতে পারে, বড়দের
সম্মান করতে পারে, ঢোকের হেফায়ত করতে
পারে, নির্জনে, ঘরের কোণে কেউ যখন দেখছে
না এমন মুহূর্তে নিজেকে পাপের হাত থেকে রক্ষা
করতে পারে, আল্লাহর শক্রদের মনে কাঁপন
ধরিয়ে দিতে পারে। সাহসিকতা, নিভীকতার
সঙ্গে চিকনা না মোটকু না সৃষ্টাম দেহ—এসব
জড়িত না। নিজের শুকনা শরীর নিয়ে কক্ষনো
ইন্সম্যন্তায় ভুগবে না। এই শরীরের বড়ত্ব,
এই শরীর দিয়ে ভাব মারা, ধরাকে সরা জ্ঞান
করা মালাকুল মওতের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার
সঙ্গে সঙ্গে শেষ হয়ে যাবে। মাটিতে পচে যাবে।
পোকা ধরবে। আর আল্লাহর কাছে তুমি কেমন
সম্মানিত তা তুমি দেখতে কেমন, শুকনা না
মোটা এসবের ধার ধারে না।

‘নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট তোমাদের মধ্যে সেই
ব্যক্তি অধিক সম্মানিত যিনি তোমাদের মধ্যে
সর্বাধিক খোদাভীরু। নিঃসন্দেহে আল্লাহ সবকিছু
জানেন এবং সব বিষয়ে অবহিত’।^[৬]

একটা বয়সে অনেকেই একটু শুকনা থাকে।
তারপর যখন বয়স বাড়তে শুরু করে তখন
তালপাতার সেপাই থেকে ভুঁড়ির আড়তদার
হয়ে যায়। এগুলো নিয়ে চিন্তা করবে না। সব
ঠিক হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। রাত জাগবে না।
সকাল সকাল ঘুম থেকে উঠবে। ব্যায়াম করবে।
বিস্তারিত গাইডলাইন ইনশাআল্লাহ দেওয়া হবে
সামনের পর্বে।

ভালো থাকো।

(চলবে ‘ইনশাআল্লাহ...’)

[৩] সাহাবা কেরামায়ের ঈমানদীপ্তি জীবন, প্রথম খণ্ড, ড.
আবদুর রহমান রাফাত পাশা, রাহনুমা প্রকাশনী

[৪] MACHO MEN OF TODAY - Sheikh Zahir
Mahmood | Strong Words | HD-<https://tinyurl.com/yccknn3aa>

[৫] Abdullah Ibn Mas'ud (radhi Allahu anhu) by
Qari Sohaib Ahmed- <https://tinyurl.com/25n3embu>
৫২০ মোলো

[৬] সূরা হজরাত : ১৩

କୀଡ଼ାବେ

ଅର୍ଥନୈତିକ ମୁକ୍ତି

ଅର୍ଜନ କରବ?

- ଡାରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଇସନାମ
ସହପ୍ରତିଷ୍ଠାତା, ଓର୍ଫାଫିଲ୍ସ ଇଂଜିନିୟର



অধিকার্থ মানুষ প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে টাকার পেছনে জীবনের দীর্ঘ সময় ব্যয় করে থাকে। নিজেদের আরাম-আয়েশ বিসর্জন দিয়ে একটু সুখ-স্বাচ্ছন্দের জন্য দিনরাত পরিশ্রম করে। ব্যস্ততার কারণে তারা না পারে পরিবারকে পর্যাপ্ত সময় দিতে, না পারে কাঞ্চিত জীবনযাপন করতে। শুধু টাকার জন্য দিনের পর দিন তাদের এমন সব কাজ করতে হয় যেখানে তাদের বিশ্বাস আগ্রহ নেই। তাদের এই কঠ্রে একটাই লক্ষ্য— অর্থনৈতিক মুক্তি। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে এই লক্ষ্য আজীবন তাদের নাগালের বাইরেই রয়ে যায়। সত্যিকারের অর্থনৈতিক মুক্তি কখনোই হাতের নাগালে আসে না। কেন এমন হয়? কেন গরিব আরও গরিব হয়, ধনী আরও ধনী হয়, মধ্যবিত্ত সারাজীবন সংগ্রাম করেই যায়?

তোমরা হয়তো দেখেছো অনেক অশিক্ষিত মানুষ প্রচুর টাকাপয়সার মালিক। অনেকেই অনেক প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করছেন প্রচলিত অর্থে বিশেষ শিক্ষিত না হয়েই। অথচ তাদের প্রতিষ্ঠানে উচ্চ ডিগ্রিধারী শিক্ষিত কর্মচারীরা অল্প বেতনের চাকরি করে থাকেন। এটা কি শুধুমাত্র ভাগ্য? পার্থক্যটা কোথায়? আসলে এই মানুষগুলো একাডেমিক ডিগ্রি থাকলেও তারা আর্থিক শিক্ষার দিক দিয়ে নিরক্ষর (**Financially illiterate**)। অপরদিকে আমি যে তথাকথিত অশিক্ষিত মালিকের কথা বলছি তার একাডেমিক ডিগ্রি না থাকলেও আর্থিক শিক্ষার দিক বিবেচনায় শিক্ষিত (**Financially literate**)।

পরিবার এবং স্কুল থেকে আমাদের শেখানো হয়- ভালো করে পড়াশোনা করো, ফার্স্ট হও, তাহলে ভালো কোম্পানিতে চাকরি করতে পারবে। অপরদিকে বিভিন্নদের কথাগুলো

এমন - ভালো করে পড়াশোনা করো যাতে ভালো কোম্পানির

মালিক হতে পারো। অর্থনৈতিক বিষয়ে মধ্যবিত্ত ও গরিবদের দৃষ্টিভঙ্গির তুলনায় ধনীদের দৃষ্টিভঙ্গির বিষ্টির পার্থক্য রয়েছে। “অর্থই অনর্থের মূল” এরকম আজগুবি কথা আমাদের পড়ানো হয়। অথচ টাকা-পয়সা হচ্ছে এক বিশেষ ধরনের ক্ষমতা বা পাওয়ার। আমাদের শুধু জানতে হবে কীভাবে এই পাওয়ার ব্যবহার করতে হয়।

আমরা বিশ্বাস করি, **কঠ্রের পরিশ্রম করে কাঞ্চিত সফলতা অর্জন করা সম্ভব। আসলেই কি তাই?** একজন দিনমজুর কিংবা রিকশাচালক প্রতিদিন কঠ্রের পরিশ্রম করে থাকেন। তারা কি এই পরিশ্রম দিয়ে আসলেই তাদের লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারেন? আমি বলছি না পরিশ্রম ছাড়াই সফল হওয়া সম্ভব। কিন্তু আমাদের জানতে হবে কীভাবে বুদ্ধিমত্তার সাথে পরিশ্রম করে আমরা সঠিক লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হতে পারি।

আমাদের ঘাটতি কোথায়? আমরা কীসে মনোযোগ দেব? প্রচলিত ধ্যানধারণা এবং মানসিকতায় কিছু পরিবর্তন আনা জরুরি। এই বিষয়গুলো নিয়ে এটি একটি ধারাবাহিক লেখা হবে। প্রথম পর্বের এই লেখার শেষ অংশে তোমাদের জন্য একটি বাড়ির কাজ থাকবে। পড়া শেষ করে বাড়ির কাজটি জমা দিতে হবে।

শিখ

স্কুল-কলেজে আমরা যে পড়াশোনা করি সেটি আমাদের কেবল এক ধরনের প্রয়োজন পূরণ করে। আমাদের বাস্তব জীবনে এর বাইরে বহুগুণ পড়াশোনার প্রয়োজন। সাধারণভাবে বললে আমাদের চার ধরনের শিক্ষার প্রয়োজন:

১) ইসলামি শিক্ষা

(*Islamic Education*): ইসলামি শিক্ষা কেন্দ্রকার আশা করি আমরা সবাই জানি। আমি শুধু একটি পরেন্ট বলবো। আমাদের চূড়ান্ত কাঙ্গিত গন্তব্য হচ্ছে জান্নাত। যেহেতু এটি একটি অবধারিত গন্তব্য এবং এর কোনো বিকল্প হতে পারে না, কাজেই এখানে সফল হতে হলে আমাদের সঠিক শিক্ষাপদ্ধতি জানতে হবে এবং সর্বাধিক অগ্রাধিকার দিতে হবে।

২) একাডেমিক শিক্ষা

(*Academic Education*): প্রচলিত স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ব্যবস্থায় সার্টিফিকেট অর্জনের জন্য আমাদের একাডেমিক শিক্ষা গ্রহণ করতে হয়। আমরা স্কুল-কলেজে ভর্তি হই একাডেমিক শিক্ষা গ্রহণের জন্য। উচ্চতর বিশেষায়িত ডিপ্রি জন্য এই শিক্ষা আবশ্যিক। বাস্তব জীবনে এই শিক্ষার প্রয়োগ কর থাকলেও বর্তমান বিশ্বব্যবস্থায় এই শিক্ষা গ্রহণ না করলে বেশ সমস্যার মুখে পড়তে হয়।

৩) কারিগরি শিক্ষা

(*Technical Education*): কর্মক্ষেত্রে উন্নতি করতে কারিগরি শিক্ষার বিকল্প নেই। যেমন: কেউ যদি সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার হতে চায় তাকে প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুেজে জানতে হবে। বর্তমানে প্রায় সব ধরনের ক্যারিয়ারে ভালো করতে প্রয়োজন ইংরেজি শিক্ষা। সময়ের সম্বিদ্যার (টাইপ ম্যানেজমেন্ট), যোগাযোগ দক্ষতা (কম্যুনিকেশন স্কিল), পার্সনাল ডেভেলপমেন্ট ইত্যাদি বিষয়গুলোও কারিগরি শিক্ষার মধ্যেই পড়ে।

৪) অর্থনৈতিক শিক্ষা

(*Financial Education*): এই শিক্ষাগ্রহণের কথা বেশিরভাগ মানুষই জানে না। কম সময়ে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন করতে প্রয়োজন সঠিক অর্থনৈতিক শিক্ষা। এই শিক্ষার অভাবে সাধারণ মানুষ সারাজীবন অর্থনৈতিকভাবে সংগ্রাম করে।

এর বাইরেও সাধারণ জ্ঞান, সমসাময়িক বিষয়বিলি, ইতিহাস, সাহিত্য ইত্যাদি নানা বিষয় জানার প্রয়োজন হতে পারে আমাদের জীবনে সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য। এগুলোকে আমি টেকনিক্যাল ক্যাটাগরিতে রাখছি। তবে নিচুক বিনোদনের জন্য যেমন কোতুক, শোবিজ তারকাদের ঘটনা, অপ্রয়োজনীয় ফেসবুক স্ট্যাটাস ইত্যাদিকে আমি কোনো পড়াশোনার আওতাভুক্ত ধরছি না।

কেন অর্থনৈতিক শিক্ষা দরকার?

তোমরা হয়তো ভাবছো, আমরা তো এখনো ছেলেমানুষ। বড়দের এইসব কথাগুলো কেন তোমাদের বলছি। দুটি কারণ বলি:

প্রথমত, আমি ধরে নিচ্ছি তোমরা সবাই প্রাপ্তব্যক্ষ। ইসলামি দৃষ্টিকোণ থেকে প্রাপ্তব্যক্ষ হওয়ার পর বাবা-মা বাধ্য নয় সন্তানের ভরণপোষণের দায়িত্ব নিতে (ছেলেদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য)। তার মানে তারা তোমাদের পড়াশোনার খরচ বহন করছে এটি তোমাদের জন্য একটি বিশেষ অনুগ্রহ। এটি তোমাদের হক্ক নয়। কাজেই তোমাদের কি উচিত না খুব দ্রুত স্বাবলম্বী হওয়া?

দ্বিতীয়ত, তোমরা যখন একাডেমিক পড়াশোনা শেষ করে কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করবে তখন শুরু হবে টাকা উপার্জনের এক নতুন জীবনযুদ্ধ।

যেহেতু টাকাই এখানে মুখ্য, কাজেই আমাদের জানা উচিং কীভাবে টাকা ম্যানেজ করতে হয়। আমরা টাকার পেছনে দৌড়াবো না, টাকা যাতে আমাদের পেছনে দৌড়ায় এই দক্ষতা অর্জন করতে হবে। এজন্যই দরকার হচ্ছে অর্থনৈতিক শিক্ষা।

আশ্চর্যের ব্যাপার হল এরকম একটি বাস্তব সত্ত্ব আমরা সবাই লুকিয়ে যাই। আমাদের পরিবার, স্কুল-কলেজ-ইউনিভার্সিটি কোথাও এই ব্যাপারে আমাদের কিছুই শেখানো হয় না। এই বিষয়ে খুব সহজভাবে কিছু কথা বলবো। আশা করি অর্থনৈতিক ব্যাপারে তোমাদের ধারণা পরিবর্তন হবে, ইনশাআল্লাহ।

টাকা-পয়সা বিষয়ে আমাদের ধ্যানধারণা

অনেক মানুষ অনেক টাকা উপর্যুক্ত করেও গরিব। কারণ তারা যেমন আয় করে, ঠিক তেমনি খরচ করে। দিনশেষে তাদের কাছে কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। কাজেই কেউ যদি বেশি টাকা বেতন পায় তাহলে আসলে সেটায় লাভ নেই। কতটা উপর্যুক্ত করছে এটা বড় ব্যাপার নয়, কত ধরে রাখতে পারছে এটাই আসল। কেউ যদি হ্যাঁৎ অনেক টাকার মালিক হয়ে যায় তবুও লাভ নেই যদি সে না জানে কীভাবে এই টাকার সঠিক ব্যবহার করতে হয়। অনেকে উভরাধিকার সৃত্রে অনেক টাকার মালিক হয়েও কিছুদিন পরে আবার গরিব হয়ে যায়।

মধ্যবিত্তী টাকা সঞ্চয় করার চেষ্টা করে। কিন্তু এই টাকা দিয়ে তারা টিভি কিনে, এসি কিনে, ভালো ফ্ল্যাট ভাড়া করে তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নত করে। এতে তাদের খরচ বাড়ে, কিন্তু আয় সেই তুলনায় বাড়ে না। স্ট্যাটাস ধরে রাখতে গিয়ে মধ্যবিত্তী সবসময় একটা অর্থনৈতিক টানাপোড়েনের মধ্য দিয়ে যায়।

অনেকে হারাম কাজ করে। সুদের উপর লোন করে ফ্ল্যাট কিনে, গাড়ি কিনে। তারা ভাবে কিন্তিতে আমরা ব্যাংক লোন পরিশোধ করে দিলে এগুলো অ্যাসেট (asset-সম্পদ) হিসেবে থেকে যাবে। বিপদের সময় কাজে লাগবে। এগুলো কি আসলেই তাদের সম্পদ? তোমরা যদি ব্যাংকের ব্যালেন্স শিট দেখো তাহলে দেখবে এইগুলো ব্যাংকের অ্যাসেট (asset)। তার মানে এইগুলো তাদের দেনা (liability)। এই দেনা বাড়ার কারণে তারা আসলে আরও গরিব হচ্ছে যা তারা বুঝতেই পারছে না! সেই সাথে সুদের মতো গর্হিত হারাম কাজে জড়নোর ব্যাপারটি তো আছেই।

আমাদের কাজ হচ্ছে অ্যাসেট (asset) বাড়নো সেইসাথে লায়াবিলিটি (liability) বা দেনা কমিয়ে রাখা। এটাই ঝল নাম্বার ওয়ান বা এক নম্বর নিয়ম। পরবর্তী পর্বে আমরা এই বিষয়ে কথা বলবো, ইনশাআল্লাহ।

বাড়ির কাজ

তোমাকে যদি ১০০০ টাকা দেওয়া হয় তুমি কত দ্রুত এটাকে ২০০০ টাকা বানাতে পারবে? কীভাবে বানাবে? নিচের লিংকে গিয়ে তোমরা তোমাদের পরিকল্পনা লিখে পোস্ট করো। আমরা দেখতে চাই টাকা-পয়সা নিয়ে তোমাদের চিন্তাভাবনা কেমন।

<https://tinyurl.com/yc3ch28f>





ପର୍ଦା

— ଜିମ ତାନଭାର

ଏକ.

ଟେଲିଭିଶନ ବା ମିଡ଼ିଆ ଆସାର ଆଗେର ସମୟଟାଯି ସେଲିବ୍ରେଟିଶିପ-ଏର ବ୍ୟାପାରଟା ଠିକ କିଭାବେ କାଜ କରତୋ ଆମର ଜାନା ନେଇ। ଯାରା ଜନପ୍ରିୟ ବା ତାରକା ଛିଲେନ ତାଦେରକେ ସାମନାସାମନି ଦେଖାର ସୁଯୋଗ ବେଶିଭାଗ ମାନୁସେରଇ ହତୋ ନା। ମାନୁସ ହସତୋ ବିଖ୍ୟାତ ମାନୁସଦେର କଥା ନା ତାଦେର ନାମ “ଶୁଣେହେ” କେବଳ, ଅଥବା ବଡ଼ଜୋର ବିହ୍ୟେର ପାତାଯ ପଡ଼େଛେ, କିନ୍ତୁ ଦେଖେହେ ଖୁବ କମାଇ। ଯେ କେଉ ଚଟ କରେ ବିଖ୍ୟାତ ହତେ ପାରତୋ ନା, ହଲେଓ ତାର ନାମଭାକ ଏତ ଛଡ଼ାତୋ ନା, ଆର ଛଡ଼ାଲେଓ ଅତଟା ମାତାମାତି ଛିଲ ନା।

ଏରପର ଏକଟା ସମୟ ଆସଲୋ ସଥିନ ଟେଲିଭିଶନେର ପର୍ଦା ଆମରା କିଛୁ ମାନୁସକେ ଦେଖିତେ ଶୁରୁ କରଲାମ। ଅଛୁ କିଛୁ ମାନୁସ, ଚେନା କିଛୁ ମୁଖ, ଘୁରେଫିରେ ତାଦେରକେଇ ଦେଖା ଯେତା। ତାରା ଛିଲ ତାରକା, ଆର ଆମରା ବାକିରା ହଲାମ ଦର୍ଶକ। ତାରକାଦେର ଦର୍ଶନ ଏର ପରିସର ବେଡ଼େ ଗେଲୋ ବହୁଗୁଣେ। ତୈରି ହଲୋ ଏକଟା “ପର୍ଦା”, ପର୍ଦାର ଓପାରେ କିଛୁ ମାନୁସ ଦେଖା ଦିଲୋ, କଥା ବଲଲ, ଅଭିନ୍ୟ କରଲ, ଗାନ ଗାଇଲ, ନାଚଲ— ଆର ଆମରା ପର୍ଦାର ଏପାର ଥେକେ ମୁଢ଼ ହତେ ଲାଗଲାମ। ପର୍ଦାର ଓପାରେର ମାନୁସଗୁଲୋକେ ଆମରା କଥନୋ ସାମନାସାମନି ଦେଖିନି, କଥା ବଲିନି, କାହୁ ଥେକେ କଥନଓ ଖୋଜ ନିଇ ନି, ଜାନତେ ପାରିନି ମାନୁସଗୁଲୋ ଆସଲେ ଠିକ କେମନ

— কিন্তু তাদের প্রতি আমাদের ভালোলাগা, মুঞ্চতা আর কৌতুহল জড়ো হলো — যেমন করে আগুনের কাছে একরাশ উইপোকা জড়ো হয়।

কিন্তু খুব বেশিদিন পর্দার এপারে আর থাকা গেলো না। পর্দার ওপারের মানুষগুলোকে দেখতে এত ভালো লাগে, নিজেকে কেন স্থানে দেখা নয়? ইটারনেট নিয়ে আসলো নতুন একটা পর্দা — সোশাল মিডিয়া। স্যাটেলাইট টিভির মতো তার অনেকগুলো চ্যানেল — ফেইসবুক, ইল্টাগ্রাম, ইউটিউব, টুইটার, টিকটক। টেলিভিশনের পর্দায় “চান্স” পাওয়া সহজ ছিল না, কিন্তু এই পর্দায় খুব সহজেই চাইলে নিজেকে দেখানো যায়, আর ভিট পাওয়া যায় — শুধু কোনোরকমে একটা কেন্টেন্ট বানাতে পারলেই হলো।

প্রশংসা পেতে সবাই ভালো লাগে। আর মানুষের এই স্বভাবজাত চাওয়ার এক বাঁধাঙ্গা বহিঃপ্রকাশ আমরা দেখছি এই যুগে। কমেডি, লিপসিক, নাচ, ওয়েডিং ফটোগ্রাফি, ঘূরতে গেলেই চেকইন, ট্রলভিডিও — এই সবকিছুর পেছনে মূল চাওয়া আমাদের একটাই — পর্দার এপারে পারফর্ম করে ওপারের মানুষদের কাছে আমরা প্রশংসা আর বাহবা চাই। বেশিরভাগের মানুষের আর কোনো উদ্দেশ্য এখানে থাকে না।

দুই:

মানুষের স্বভাব হচ্ছে সে মানিয়ে নেয়। কিছু একটা অভ্যাসে পরিণত হলে স্টোকে সে প্রশ্ন করে না। নতুন কিছু পেলে পুরোনোকে ভুলে যায়। অর্থহীন কাজ বারবার করতে থাকলে স্টোও একসময় গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়।

সোশাল মিডিয়ায় ডুবে যাওয়ার পর আমরা শুধু হিসেব করেছি — কী পেয়েছি? এই হিসাব করি নি — কী হারিয়েছি। প্রথমেই আমরা যা

হারিয়েছি, তা হলো “কাছের মানুষ”। সোশাল মিডিয়ার বদৌলতে আমরা যাদেরকে চিনেছি, ভালোবেসেছি, যাদের জন্য পাগল হয়েছি — তাদের ক্ষতজনকে আমরা ঠিকমতো চিনি? তাদের ব্যক্তিগত জীবনে তারা কেমন — স্টো কি আমরা জানি? মানুষগুলোকে যতটুকু চমৎকার দেখাচ্ছে, সে কি তার কাছের মানুষদের সাথে আরো ভালো? বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই কিন্তু আসলে উল্টোটা হয়। নারী অধিকারের হ্যাশট্যাগ দিয়ে ফেইসবুক ক্যাম্পেইন করা ছেলেটার চরিত্র খুব খারাপ, আর মেয়েটা ঘরে কাজের নেয়েকে পেটায়। দেশপ্রেমের তান ধরা লোকটা একটা আস্ত ডাকাত অথবা হাজার মানুষের জন্য মোটিভেশনাল ভিডিও বানানো মানুষটা নিজ ঘরে বড় একা। যদি কাছ থেকে দেখা যেত, তাদের বেশিরভাগকেই মানুষ ঘৃণা করত।

অথবা, যদি এমন হয়, আমি নিজে একজন সেলিব্রেটি, প্রতিনিয়ত লাইক কুড়িয়ে ফিরছি — ভেবে দেখি, আমাকে যারা লাইক দিচ্ছে, বাহবা দিচ্ছে — তাদের ঠিক কয়জন আমার কাছের মানুষ? তারা আমাকে সত্যিকার অর্থে কী দিচ্ছে একটা ক্ষণিকের ভালোলাগার অনুভূতি ছাড়া? এই ক্ষণিকের ভালোলাগার অনুভূতি আসলে এক প্রকার মাদকের মতো। যেটা নিতে ভালো লাগে, কিন্তু জিনিসটা মোটেও ভালো কিছু না। সোশাল মিডিয়াতে আমরা প্রতিনিয়ত অসংখ্য মানুষের সাথে যোগাযোগ করছি নিজের জীবন থেকে অনেকগুলো সময়কে খরচ করে — কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমরা সামান্য ‘মজা পাওয়া’ ছাড়া কিছুই আর পাচ্ছি না।

বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সোশাল মিডিয়ায় আমরা যাদের সাথে যোগাযোগ করি, তাদের সাথে আমাদের সত্যিকারের কোনো সম্পর্ক গড়ে উঠে না, তারা আমাদের ‘কাছের মানুষ’ হয়ে উঠতে পারে না। অবিশ্বাস্য দ্রুততায় ভার্চুয়াল

মানুষগুলোকে আমরা ভুলেও যাই। প্রয়োজনে, কষ্টে, বিপদে, একটুখানি অপছন্দ হলে – না আমি তাদের পাশে দাঁড়াতে পারি, না তারা আমার পাশে দাঁড়াতে পারে। প্রচণ্ড ঝুঁকে এই সম্পর্কের পেছনে এতটা সময় বিনিয়োগ করে লাভের খাতায় যা পাচ্ছি, হারাচ্ছি তার বহু গুণ—সময়, মানুষ, ভালোবাসার সম্পর্ক।

সময়ের সাথে সাথে মানুষের চাওয়াগুলো বদলায়। ছেটবেলায় পছন্দের একটা খেলনা না পেলে একটা বাচ্চা যখন কাঁদে তখন মনে হয় যেন তার মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়েছে। কৈশোরে ভর করে যতসব পাগলামি। মৌবন যখন দরজায় কড়া নাড়ে তখন প্রেম, বিনোদন আর কিছু একটা নিশ্চিত আয়ের পথ। কিন্তু সবকিছু ছাড়িয়ে একটা মানুষ যখন তার শেষ গন্তব্যের দিকে যেতে থাকে, ফেলে আসা জীবনের বেশিরভাগ জিনিসকেই তার কাছে অর্থহীন মনে হয়, তার কাছে দারী হয়ে উঠে ‘কাছের মানুষ’রা, তাদের ভালোবাসা এবং আদর-যত্ন। আর দুনিয়াকে যখন সে বিদায় দেয় তখন তার কাছে থাকে কেবল দুটি সম্পদ – ঈমান এবং ভালো কাজ।

এই সোশাল মিডিয়া আমাদের দুনিয়া এবং দুনিয়ার পরের জীবনের গুরুত্বপূর্ণ এই চাওয়াগুলোকে কেড়ে নিচ্ছে। চাওয়া না বলে প্রয়োজন বলা ভালো। কাছের মানুষ ছাড়া দুনিয়াতে মানুষ অসহায়, ঈঙ্গান আর ভালো আমল ছাড়া আধিরাতে অসহায়। দিনের সবচেয়ে বেশি সময় আমরা যেটা করছি সেটা হচ্ছে শ্রেফ শো-অফ, এমন কিছু মানুষকে দেখাচ্ছি, যারা আমাদের কার্যত কোনো কাজে আসে না। এমন কিছু মানুষকে ভালোবাসছি যারা চলনে-কথনে ভাবি সুন্দর, কিন্তু যার অস্তরে কিছুই নেই।

আমাদের মধ্যে এমন আছে যারা সোশাল মিডিয়ার এই পর্দায় নিজেকে দেখিয়ে বেড়ানোর মত যথেষ্ট cool নয়। তারা অন্যের পাওয়া দেখে নিজের না-পাওয়ার হিসেব করে অপ্রাপ্তির তালিকা তৈরি করছে। তারা ভুলে যাচ্ছে পর্দার মানুষগুলোর ভেতরে কী আছে, তাদের না-পাওয়াটা আরো কত তীব্র।

তিম.

ভাই ও বোনেরা, পৃথিবীতে আমরা খুব অল্প একটা সময়ের জন্য এসেছি। যখন আমাদের রবের কাছে ফিরে যাবার সময় আসবে, তখন এই পৃথিবী যে কতটা তুচ্ছ, সেই বোধ আমাদের আসবে বা বলা চলে দুনিয়ার মোহন্দস হবে। আল্লাহ তাআলা বারবার বলেছেন, দুনিয়ার জীবন ধোঁকা ছাড়া কিছুই নয়।

ফেইসবুক, ইনস্টাগ্রাম, টিকটক বা ওয়েডিং ফটোগ্রাফির পর্দায় নিজেকে দেখাতে বা অন্যকে দেখতে গিয়ে আমরা যা হারাব, তা কখনও ফিরে পাবার নয়। যাদের প্রশংসা কুড়াতে আমরা এতটা ব্যস্ত হচ্ছি, তারা এই জীবনেই আমাদের ভুলে যেতে এতটুকু সময় নেবে না। কাছের মানুষগুলো কিন্তু সহজে আমাদের ছেড়ে যায় না। তাদের জন্য আমাদের সময় কই?

‘পর্দা’য় একজনকে দেখতে ভালো লাগে, কিন্তু পর্দায় ঠিক ততটুকুই দেখি যতটুকুতে কারো স্বার্থ আছে। এই পর্দাটাকে প্রয়োজনের বাহিরে সিরিয়াসলি নেওয়ার কিছু নেই। এই পর্দা যদি আমার মন থেকে আল্লাহ তাআলাকে ভুলিয়ে দেয়, যদি দেখিনি এমন মানুষগুলোকে খুব গুরুত্ব দিতে শেখায়, তবে সেই পর্দাকে ছিঁড়ে ফেলি।

একদিন চোখের পর্দা খুললে যেন কাঁদতে না হয়।

দুর্মা মিঠি

কেউই তোমার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না।
লস্ট মডেল্স



সিনেমার নায়কদের দেখা যায় একাই ১০/১২ জনকে তিসুম তিসুম পিটিয়ে নায়িকাকে গুণ্ডাদের হাত থেকে বাঁচায়। ব্যাটম্যান, সুপারম্যান, স্পাইডারম্যান... আরও কত ম্যান রয়েছে। এসব সুপারহিরোদের অসম্ভব ক্ষমতাধর হিসেবে দেখানো হয়। নিমিষেই শক্রদের মেরে কচুকাটা করে ফেলে। ভয়ঙ্কর ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করে পৃথিবীবাসীকে। রূপালি পর্দার এসব হিরোরা শুধুই কল্পনার। বাস্তবে তাদের দেখা পাওয়া যায় না। তবে তুমি যদি চাও, বাস্তবেই এসব কঞ্জিত সুপারহিরোদের চাইতেও অনেক বেশি শক্তিশালী হতে পারবে। সত্যিকথা বলতে তুমি এতই ক্ষমতা লাভ করতে পারবে যে, কেউই তোমার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। দূর হয়ে যাবে তোমার সকল ভীতি। তুমি হবে অস্মভব সাহসী, শক্তিশালী একজন মানুষ। ব্যাটম্যান বা স্পাইডারম্যানের চাইতেও।

-ধূর ভাই, মজা করেন কেন? আপনি আমার সম্পর্কে জানলে আর এমন কথা বলতেন না। রাস্তা ঠিকমতো পার হতে পারব কি না সেই ভয়ে আশ্চৰ্য বা বড়ভাইয়া আমাকে একা ছাড়ে না। ছিনতাইকারীদের মধ্যেও আমার ব্যাপক জনপ্রিয়তা। আর চুপি চুপি একটা কথা বলি আপনাকে, বাথরুমে একা যেতেও মাঝে মাঝে ভয় লাগে। রাতের বেলা। সেই আমি কীভাবে এমন সাহসী হব? গুলবাজি কইরেন না আমার সাথে!

না, আমি গুলপটি মারছি না। সত্যিই! তুমি যদি বিশ্বাস করো আর যা করতে বলছি তা করো, তাহলে তুমি হবে দুর্দান্ত সাহসী একজন মানুষ। পৃথিবীর সবচেয়ে সাহসীদের তালিকার প্রথম দিকে থাকবে তুমি!

তোমাকে যা করতে হবে তা হলো, প্রতি সকাল ও সন্ধ্যায় এই দুআটা বুঝে বুঝে ৩ বার পড়তে

হবে। তাহলে সেদিন কেউই তোমার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না ইনশাআল্লাহ।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

* বাংলা উচ্চারণ : বিসমিল্লাহিল্লায় লা ইয়াদুররুমা'আসমিহি শাইয়ুন ফিল আরদি ওয়ালা ফিসসামা-য়ি ওয়া হুয়াস সামিউল 'আলীম।

* অর্থ : (**আমি আমার দিন বা রাতের মূচ্ছনা করছি**) ওই আল্লাহর নামে, যার নামের সঙ্গে আসমান জমিনের কোনো কিছু কোনো ধরনের ক্ষতি করতে পারে না; তিনি সর্বশ্রেতা ও সর্বাঙ্গ।)

মুহাম্মাদ ﷺ বলেছেন, ‘কোনো ব্যক্তি প্রতিদিন সকাল-সন্ধ্যায় এই দুআটি তিনবার পড়বে, আর কোনো কিছু তাকে কোনো ধরনের ক্ষতি করবে— এমনটি হতে পারে না।

অন্য এক বর্ণনায় আছে : সকালে পড়লে সন্ধ্যা পর্যন্ত অতর্কিত কোনো বিপদে সে আক্রান্ত হবে না। আর সন্ধ্যায় পড়লে পরদিন সকাল পর্যন্ত অতর্কিত কোনো বিপদে সে আক্রান্ত হবে না। আল্লাহর নবি মুহাম্মাদ ﷺ তো আর মিথ্যা কথা বলবেন না, তাই না? (নাউয়ুবিল্লাহ) কাজেই সকাল-সন্ধ্যায় বিশ্বাসের সাথে এই দুআটা পড়ো, আর হয়ে যাও দুনিয়ার সবচেয়ে সাহসী ব্যক্তি। কারণ, আজ থেকে কেউই তোমার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না...

বায়ু দূষণ

তৌহিদি তিয়াস

২০০৩-০৪ এর দিকের কথা। রাজশাহীতে
সাধুর মোড়ে থাকতাম তখন। বাসা থেকে দুইটা
মাসজিদের দূরত্ব প্রায় সমান। কখনো মীরের
চক মাসজিদে যেতাম, কখনো যেতাম রাণীনগর
মাসজিদে। তবে জুমুআর সালাতে চেষ্টা করতাম
রাণীনগর মাসজিদে যেতো। কারণ, সেখানকার
ইমাম প্রতি জুমুআয় প্রথম রাকাতে সুরা
আ'লা পড়তেন। যার শেষ অংশে আছে-

إِبْرَاهِيمٌ وَمُوسَىٰ

এই অংশটা শুনতে খুব মজা লাগত; কেননা, আমার
চাচার নাম ইবরাহীম, আর ফুফাতো ভাইয়ের নাম
মূসা।

এই রাণীনগর মাসজিদে আসরের পর বুখারির
হাদিস থেকে সংক্ষেপে আলোচনা করতেন
ইমাম সাহেব। একদিন আলোচনা হচ্ছিল ওয়ু
ভেঙে যাওয়ার ব্যাপারে অথবা অতিরিক্ত সন্দেহ
হওয়ার প্রসঙ্গে। ইমাম সাহেব বোঝালেন শুধু
শুধু অতিরিক্ত সন্দেহ হলে পাত্তা দেওয়ার
দরকার নেই। স্পষ্ট কারণ পাওয়া গেলে বুঝতে
হবে ওয়ু ভেঙে গেছে, নতুবা ভাঙবে না।

স্পষ্ট কারণের কিছু উদাহরণ দিলেন। একটা
উদাহরণ ছিল বায়ুর গন্ধ পাওয়া, অর্থাৎ ওয়ু
ভেঙে বলে নিশ্চিত হওয়ার একটা উপায়
হলো বায়ুর গন্ধ পাওয়া।

বাসা থেকে মাসজিদ যাওয়ার রাস্তায় এক
জায়গায় পাশে একটা ডোবা ছিল। সেখানে বেশ
দুর্গন্ধ থাকত। আমি মাসজিদে যাওয়ার সময় ঐ
জায়গাটা পার হতাম নাক চেপে। পাছে বায়ুর
মাধ্যমে সেই গন্ধ নাকে চলে আসে আর ওয়ু
ভেঙে যায়!

তোমাদের মাথাতে অনেক প্রশ্ন ঘোরে। লজ্জা,
কিন্তু মানুষ কী ভাববে, প্রশ্ন করলে ঝাসের
পোলাপান পঁচানি দেবে ইত্যাদি ভেবে আর সেই
প্রশ্নগুলো করো না। যার ফল হয়, আমার নাক
চেপে ধরার মতো! প্রশ্ন করো। প্রশ্ন না-করলে
শিখবে কীভাবে?



স্বপ্নে হনো ভুমি!

ড. শানিদ সাইফুল্লাহ

**নিষ্পাপ শৈশবের পরপরই আসে দুরন্ত
কৈশোর।** চারপাশের সবকিছু তখন অন্য
রকম লাগে! কিছুদিন আগেও যে জিনিসটার
প্রতি কোনো আকর্ষণই কাজ করত না, এ সময়ে
তা যেন চাঁদনী রাতের জোছনার মতো ভালো
লাগা শুরু করে। আবার কিছু ব্যাপার বড় বেশি
বিরক্তিকর লাগে।

বয়ঃসন্ধির এই সময়টাতে তোমাদের নিজেদের
মধ্যে অনেক পরিবর্তন দেখতে পাবে। কিউট
মিষ্টি কঢ়ের ছেলের গলাটা হ্যাঁ করেই কেমন
বেসুরো হয়ে যাবে। কথা বললে ভাঙ্গা বাঁশির
মতো আওয়াজ করবে। মস্ণ গালে দাঢ়ি-গোঁফ
উঁকি মারবে। সাথে ঘটবে কিছু শারীরবৃত্তীয়
পরিবর্তন।

শারীরবৃত্তীয় পরিবর্তনের মধ্যে যে ব্যাপারটাতে
অনেকেই ঘাবড়ে যায় তা হলো Wet Dream
বা স্বপ্নদোষ। ঘুমের মধ্যে লিঙ্গ থেকে আঠোলো
জাতীয় একটা পদার্থ বের হওয়াকে স্বপ্নদোষ বলা

হয়। কিন্তু এটা কোনো ‘দোষ’ নয়। যাহোক, প্রথম
প্রথম স্বপ্নদোষ হতে দেখে অনেকেই ব্যাপারটা
বুঝে উঠতে পারে না। দুষ্ট বন্ধুদের পান্নায় পড়ে
স্বপ্নদোষ নিয়ে তখন অনেক উলটা পালটা জ্ঞান
অর্জন হয়, যেসবের অধিকাংশই সত্য থেকে
লক্ষ-কোটি ক্রেশ দূরে। এবং অনেক ক্ষতির
কারণ হয়ে দাঁড়ায়। আবার অভিভাবকেরাও
লজ্জার কারণে তোমাদের সাথে এগুলো নিয়ে
আলাপ করতে পারেন না। তাই, আজকে আমরা
স্বপ্নদোষ নিয়ে কিছু প্রাথমিক ব্যাপার-স্যাপার
জ্ঞান চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ!

স্বপ্নদোষ কি কোনো রোগ?

- এটা কোনো রোগ বা পাপ নয়। সম্পূর্ণ
প্রাকৃতিক বিষয়। একদমই ক্ষতিকর কিছু নয়।
আল্লাহ আমাদের শরীরে একটি বিশেষ উদ্দেশ্যে
এটি দিয়েছেন। আমাদের ভালোর জন্যেই। এটার
মাধ্যমে বোঝা যায় যে, তুমি সাবালকে পরিণত

হয়েছ।

▪ **তাহলে কারও মাসে দু/একবার, কারও প্রতিদিন একবার, আবার কারও বছরে একবার কেন হয়?**

- সবার শারীরিক ক্রিয়া একরকম নয়। একেক জনের একেক রকম। যেমন, কেউ বরফ ঢিবিয়ে খেয়ে ফেলে, আবার কেউ ঠাণ্ডা পানি খেলেই টেসিল ফুলে যায়! এ কারণেই কারও বছরে একবার, কারও দৈনিক একবার করে স্বপ্নদোষ হলেও ব্যাপারটা নিজ নিজ ক্ষেত্রে ‘নরমাল’।

▪ **আমার কখনোই স্বপ্নদোষ হয়নি/ আমার একেবারেই স্বপ্নদোষ হয় না। এটা কেন?**

- স্বপ্নদোষ হওয়া যেমন স্বাভাবিক একটা প্রক্রিয়া, তেমনি না-হওয়াও একদমই স্বাভাবিক বিষয়।

স্বাভাবিক অবস্থায় একজনের দেহে প্রতি সেকেন্ডে ১১ হাজার শুক্রাগু তৈরি হয়। এতে থাকে শরীরের জন্য প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদান। সাধারণ অবস্থায় দরকারি উপাদানগুলো শরীর শোষণ করে নেয়। অবশিষ্ট অংশ ফ্যাগোসাইটেসিস (Phagocytosis) প্রক্রিয়ায় নিঃশেষ হয়ে যায়। এরপরও যা বাকি থাকে তা স্বপ্ন দেখে বা স্বপ্ন দেখা ছাড়াই বের হয়ে আসে।

কারও যদি এ উপাদানগুলো শরীরে শোষিত হওয়ার পর অবশিষ্ট অংশ ফ্যাগোসাইটেসিস (Phagocytosis) প্রক্রিয়ায় ব্যালেন্স হয়ে যায়, তাহলে তার আর স্বপ্নদোষ হবে না।

সুতরাং, কারও প্রতিদিন স্বপ্নদোষ হওয়া যেমন তার জন্য স্বাভাবিক, তেমনি কারও কখনোই স্বপ্নদোষ না-হওয়াও নিজ নিজ ক্ষেত্রে স্বাভাবিক।

▪ **আগে তো এমন ভিল না! এখন এত ঘন ঘন হয় কেন? / এখন আর হয় না কেন?**

- শোনো, আমাদের দেহ এক বিশাল সুপার কম্পিউটারের চেয়েও বেশি সিস্টেম দিয়ে প্রোগ্রাম করা। দেহে প্রতিনিয়ত অনেক জৈব রাসায়নিক কর্মকাণ্ড হচ্ছে। এসবের সাথে নিবিড় সম্পর্ক আমাদের জীবনাচরণ, খাদ্যাভ্যাস ও পরিবেশের। এসবের কোনোটার পরিবর্তনের ফলে দেহে কিছুটা পরিবর্তন আসে। এখন নিজ

নিয়মেই এটা আবার ক্রমান্বয়ে আগের মতো হয়ে যেতে পারে বা এর কমবেশি করে বা একই রকম থেকে ‘স্টে’ হয়ে যেতে পারে! এই পরিবর্তনটাও শারীরবৃত্তীয়।

▪ **কিন্তু, আমার যে ক্ষতি হচ্ছে? শরীর ভেঙে আচ্ছে। আমি নিঃশেষ হয়ে আচ্ছি!**

- সত্যি কথা বলতে; গা ম্যাজম্যাজ করা, দুর্বল দুর্বল লাগা, কিছু মনে থাকে না, পড়ায় মন বসে না ইত্যাদি সমস্যাগুলো স্বপ্নদোষের জন্য নয়। স্বপ্নদোষকে ‘দোষ’ মনে করার জন্য। মানে ‘মানসিক’ যে বোঝা তুমি বয়ে বেড়াচ্ছ, তা-ই তোমার শাস্তি কেড়ে নিচ্ছে। তবে হ্যাঁ, যদি অশ্লীল ভিডিও দেখা বা অন্য বাজে অভ্যাসগুলো ছাড়া কেবল ‘স্বপ্নদোষ’ হতে হতে শরীরের ওজন কমে যায়, গাল-চাপা ভেঙে যায়, চোখ গর্তে ঢুকে যায়, দৃষ্টি ঝাপসা হয়, তবে তা স্বপ্নদোষের জন্য না। অন্য কোনো রোগের জন্য।

এফেক্টে তোমার চিকিৎসকের শরণাপন্ন হওয়া
প্রয়োজন।

আর যদি উপরোক্ত বাজে অভ্যাস থেকে থাকে,
তাহলে তো বুঝতেই পারছ! আগে এসব একদম
বাদ দিতে হবে। বাদ মানে পুরোপুরি বাদ। আর
একবারও করা যাবে না। এরপর শরীরের
নিজস্ব পদ্ধতিতে ঠিক হওয়ার জন্য অপেক্ষা
করতে হবে। ধৈর্যের বিকল্প নেই। বহুদিনের ক্ষয়
রাতারাতি পূরণ হয় না। মনে রাখবে—একদিনে
সব হয় না, তবে একদিন সব হবে।

▪ স্বপ্নদোষ হলে কি গুনাহ হবে?

- না। তবে তুমি এ অবস্থায় অপবিত্র হয়ে যাবে।
পরিপূর্ণভাবে গোসল (যেটাকে আমরা ফরয
গোসল বলে থাকি) না-করলে তোমার সালাত
আদায় হবে না।

▪ বুঝলাগ ভাই, এটা রোগ না, তাই চিকিৎসাও নাই। কিন্তু মন তো মানে না! এটা কমানোর উপায় বলেন!

- হ্যাঁ, এটা রোগ না। কিন্তু ‘শারীরবৃত্তীয়
পরিবর্তন’! আর এর চিকিৎসা আছে। মনে
রাখবে, চিকিৎসা মানেই ‘ঔষধ’ নয়। অনেক
সময় কিছু উপদেশও চিকিৎসার অংশ।

তোমার চিকিৎসা ৪ টা

১. মানসিক ও শারীরিক স্থিরতা আনো :

- এটাকে রোগ/পাপ/খারাপ কিছু ভাবা বাদ
দাও। মানসিকভাবে চাঞ্চা থাকো।

- যেকোনো অশ্লীল চিন্তা পরিহার করো।

- দেহ মাত্রাতিরিক্ত ক্লান্ত হয়, এমন কাজ করবে
না।

- ক্ষি হ্যান্ড এক্সাইজ করো (খালি হাতে
সাধারণ শরীরচর্চা) করো। যেমন- হাঁটা, দৌড়ানো
(জগিং), বুকডন (পুশআপ), দাঁড়ি খেলা,
সাঁতার, স্কোয়াটিং, মাউন্টেইন ফ্লাইস্বার, প্লাঙ্ক
এসব। নিজের সক্ষমতা অনুযায়ী। এগুলোর
কিছু নিয়ম কানুন আছে। এগুলো পাবে মোলোর
দ্বিতীয় সংখ্যার এই সেখায়—

ছাত্রজীবন সুখের জীবন -

<https://tinyurl.com/chatrojibon>

ঘাম ঝারানোর দিনে -

<https://tinyurl.com/ghamdin>

২. লাইফ স্টাইল বদলাও :

- টাইট পোশাক পরবে না। ঢিলে-ঢালা জামা
পরবে।

- রাতে ঘুমানোর কমপক্ষে ১ ঘণ্টা আগে খাওয়া
ও পানি পান শেষ করবে।

- ঘুমানোর আগে ভালোভাবে প্রশ্নাব করে ওযু
করে ঘুমাবে।

- রাত জাগবে না। উপুড় হয়ে ঘুমাবে না।
কোলবালিশ ব্যবহার করবে না। ভোরে উঠে
যাবে। একবার ঘুম ভাঙ্গার পর ‘গড়াগড়ি’ করা
একদম নিয়েধ।

- স্বপ্নদোষ হয়ে গেলে ভুলেও অশ্লীল চিন্তা
করবে না। দ্রুত বিছানা ছেড়ে গোসল করে
নেবে। মন খারাপ করে শুয়ে-বসে থাকবে না।

যোদিন স্বপ্নদোষ হবে সোনি একটু সতর্ক থাকবে। বিছানা থেকে দূরে থাকবে যতটুকু পারো, একাকী অলস সময় কাটাবে না একদম। প্রয়োজনে বাহিরে ঘোরাঘুরি করবে, খেলাধুলা করবে। ভালো বন্ধু, বাবা-মা, ভাইবোনদের সাথে সময় কাটাবে।

- গোসল করার সময়েও সম্পূর্ণ উলঙ্গ হবে না। বিশেষ করে লজ্জাস্থান ধোয়ার সময় খুব সাবধান থাকবে।

৩. পুষ্টিকর খাবার খেয়ে ঝয়পুরণ করে ফেলো :

- দুর্বল লাগলে সামর্থ্য অনুসারে ডাল, দুধ, ডিম ও মাংস খাবে।

- কোষ্ঠ পরিষ্কার রাখতে গুরুপাক খাবার, তেল-চর্বি, ভাজাপোড়া বাদ দিবে। পেপেসহ অন্যান্য ফল ও শাকসবজি বেশি করে খাবে।

- কালোজিরা, মধু, খেজুর, ডেজা ছোলা, কিশমিশ, বাদাম নিয়ম করে খাবে। সকালে ঘুম থেকে উঠে ১ চা চামচ বা আরেকটু কম কালোজিরা খেয়ে পানি খেয়ে নিলো। একমুঠো বাদাম খেলে বা কয়েকটি খেজুর হলে। এগুলো স্বপ্নদোষ না-হলেও নিয়মিত খাওয়া উচিত। ফাস্ট ফুড, ভাজাপোড়া, চিপস বা কোমল পানীয় খেয়ে তুমি অনেক টাকা নষ্ট করো। সেই সাথে শরীরেরও অনেক ক্ষতি করো। এগুলো না-খেয়ে পুষ্টিকর খাবার খাও।

- পর্যাপ্ত পানি পান করবে। ইসুবগুলের ভূষি থাবে।

৪. বিশ্বাসের সাথে আঘাত করো :

- ঘুমের আগে আয়াতুল কুরআসি, সূরা ইখলাস, ফালাক, নাস তিনবার করে পড়ে

শরীর মাসাহ করা, ঘুমানোর দুআ ও অন্যান্য যিকর-আয়কারণগুলো করে হাদয়টাকে ঠাস্তা করো। এগুলো অনেক কার্যকর ভূমিকা রাখে। হিসনুল মুসলিম বই বা আ্যাপ থেকে ঘুমানোর আমলগুলো জেনে নাও। লিংক - <https://greentechapps.com/apps/hisnulbn>

- বাথরুম, গোসলখানায় প্রবেশের আগে ও বের হয়ে মাসনূন দুআ পড়বে।

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْحُبْثِ وَالْحَبَائِثِ

অর্থ : হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই অনিষ্টকরী নর ও নারী জিন-শয়তান থেকে।^[১]

وَعَافَانِي الْأَذَى عَنِّي أَذْهَبَ الْأَذْيَ لِلَّهِ الْحَمْدُ.

অর্থ : সমস্ত প্রশংসা ওই আল্লাহ তাআলার জন্য, যিনি আমার শরীর থেকে কষ্টদায়ক জিনিস দূর করে দিয়েছেন এবং আমাকে স্বস্তি দান করেছেন।^[২]

- ডান কাত হয়ে শোবে।

- আল্লাহর ওপর ভরসা রাখো।

আরেকটি কথা, রমাদান মাসে স্বপ্নদোষ কারণ কারও ক্ষেত্রে একটু বেশি হয়। এটাও স্বাভাবিক ব্যাপার। আর স্বপ্নদোষ হলে সাওম ভাঙ্গে না।

তো প্রিয় ভাই,

স্বপ্নদোষ স্বাভাবিক ব্যাপার।

ভয় পাবে না।

দুশ্চিন্তা করবে না।

[১] বুখারি, ১৪২; মুসলিম, ৩৭৫।

[২] নাসাই, সুনানুল কুবরা, ৯৮-২৫; ইবনুস সুরী, আমালুল ইয়াওমি ওয়াল-লাইলাই, ২২।



ବୁଦ୍ଧି ଖାତାଙ୍କ

ଶ୍ରୀମତୀ ମହାପିଲାନ୍ଦ ମହିଳା ସମ୍ମାନ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧାରଣେ ବଜୁଗତରେ ପ୍ରୋକ୍ତିତ ଉପରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟାତ ହେଲା: 'ପଞ୍ଚଶିଲାମ ନାମ ଗର୍ଜିଲେ, ଶାଶ୍ଵତ ବାବି 'ଆଟଟ ବହି' ପାତା' ଏହିମେ ଯାବାର ବାବେ ୫ ଅଧିକତମେ କରିବେ କିମ୍ବାଲୁକ ସେବାଲେ ହେବେବେ'।

“তাই নাই!” এই অবকাশসূচি করে চৰে দেখা সবজাতি আকৃ পরামর্শ তত্ত্ব হাতে মাধ্যমিক পর্যবেক্ষণের সুযোগ বৃক্ষ বাধা।

3

$$\bigcirc + \triangle = 15$$

$\star - \square = \square$

$\Theta = \Delta = 1$

$$\square + \star = \circ - \triangle + 8$$

$$\triangle + \circ - \star + \square = ??$$

三

3

ଏବେଳା ମାତ୍ର, ଦୁଇଲାକା ଏବା ଦୁଇଲାହେଲେ ସହିମୋହାନ
ହେଲା। ତାଙ୍କୁ ପାଇଁରେ ଏହାଟି କମ୍ ଯୋଗେ
ଯାଦିଲା ନିମ୍ନା। ତାଙ୍କ ମହି କହି ଶୋଇ
ଏହାହିଁ କିମ୍ବା ?

କେବଳ ଏକ ପରିମାଣରେ "ଶ୍ରୀମତୀ ହୁଏ ଅନ୍ଧାରୀ" ହେଉଥିଲା ଏହା କିମ୍ବା ଏହାରେ କିମ୍ବା

ମୋହନ ପାତ୍ରଙ୍କ ଇମାନ, ନିଶାଯ ଏ ହକାଜ ହାଜ ଅ ହୁଏ, ଏ ଟାଇପ୍‌ରେଜାମାନ ଏହି ଫାନ୍ଦାମଣ ଦ ବିଷ୍ଵାସ

ପ୍ରକାଶକ ପତ୍ର ଏବଂ ପ୍ରକାଶନ କମିଶନ ଅଧିକାରୀ ପତ୍ର ଏବଂ ପ୍ରକାଶନ କମିଶନ ଅଧିକାରୀ

୩୮

୧୦

$$1+9+2 = 12\text{ or }2$$

$$20+25+15 = 60$$

$$6+14+3 = 23$$

$$15 + 8 + 15 = 38$$

$$3+7+2 = 12121212$$

3



ଶେଷ ଶାଖାଗ୍ରୂ
କୃତି ଆପ୍ନଙ୍କ
ପ୍ରେକ୍ଷଣ



ঘুমের ভেতর-বাহির

মাহফুজ আলাম দিপু



ঘুম আমাদের জন্য খুব জরুরি একটা জিনিস। কিন্তু ঘুম নিয়ে মানুষের মধ্যে মিশ্র প্রতিক্রিয়া রয়েছে। কেউ মনে করেন দৈনিক ৫-৬ ঘণ্টা ঘুমানো যথেষ্ট, আবার কারও কারও দৈনিক ৯-১০ ঘণ্টা না ঘুমালে চলেই না। কিন্তু না ঘুমুলে কী হবে? ঘুমের ভেতরে আসলে কী কী ঘটে?

অনেক আগে মানুষ মনে করত, ঘুমলে মানুষের আর কোনো জ্ঞান থাকে না। তার মস্তিষ্কের সকল ক্রিয়াকৌশলও বুঝি বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু না! আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞান ঘুম সম্পর্কে চাপ্টজ্যুকর সব তথ্য আবিষ্কার করেছে। ১৯৩১ সালে হ্যাঙ বার্জার নামে এক মনোবিজ্ঞানী বিভিন্ন ব্যবসী ঘুমস্ত মানুষের মাথায় ইলেক্ট্রো লাগিয়ে মাথার ভেতরের বৈদ্যুতিক সিগনালগুলো মাপার চেষ্টা করে। তার এই গবেষণায় দেখা যায়, ঘুমস্ত মানুষের মস্তিষ্কেও অঙ্গুত সব ঘটনা ঘটে চলে। পরবর্তীতে ১৯৩৫ সালের দিকে হার্ডি ইউনিভার্সিটির গবেষকরা দেখল, ঘুমের বিভিন্ন স্তর রয়েছে ঘুম ৯০-১১০ মিনিটের একটি চক্রে আবর্তিত হয় এবং একে দুটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে : Non-REM (Non-Rapid Eye Movement- নন র্যাপিড আই মুভমেন্ট) ঘুম এবং REM (Rapid Eye Movement- র্যাপিড আই মুভমেন্ট) ঘুম। Non-Rem ঘুমের আবার চারটি ধাপ রয়েছে।

প্রথম ধাপটি হলো একেবারে প্রাথমিক স্তর। এই ধাপে আমরা থাকি আধো ঘুম আধো জাগরণের মাঝে। ঘুম থাকে খুব হালকা এবং সহজেই আমাদের ঘুম ভেঙ্গে যেতে পারে। দশ মিনিট প্রথম স্তরে অবস্থানের পর পরবর্তী দশ মিনিটের মধ্যেই আমরা পৌঁছে যাই দ্বিতীয় ধাপে। এ ধাপে শ্বাস-প্রশ্বাসের প্রকৃতি এবং হংপিণ্ডের গতি কম হয়ে আসে। এই ধাপটি ঘুমের সবচেয়ে বৃহত্তম অংশকে নির্দেশ করে। তৃতীয় ধাপে মস্তিষ্ক থেকে

ডেলটা তরঙ্গ উৎপন্ন হয়। শ্বাস-প্রশ্বাস এবং হংপিণ্ডের গতি সবচেয়ে নিচে নেমে আসে। চতুর্থ ধাপে শ্বাস-প্রশ্বাসে থাকে ছান্দিক গতি, পেশীসমূহের কার্যকলাপ থাকে সীমিত। তৃতীয় ও চতুর্থ ধাপে আমরা গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন থাকি। কোনো কারণে এই সময়ে ঘুম ভেঙ্গে গেলে আমরা সহসাই পরিবেশের সাথে নিজেদের মানিয়ে নিতে পারি না এবং এই অস্থিরতা বেশ কয়েক মিনিট স্থায়ী হয়। আমাদের অনেকের সাথেই এমন ঘটে। অনেক সময় আমরা হ্যাঁ ঘুম থেকে উঠে বুঝতে পারি না, এখন সকাল না কি বিকাল। মূলত এই স্তরে ঘুম থেকে হ্যাঁ জেগে উঠলেই এমনটা হয়। এভাবে চাল্লিশ মিনিট গভীর ঘুমের পরে মানুষ আবার আগের স্তরে ফিরে যেতে থাকে; চতুর্থ থেকে তৃতীয়, তৃতীয় থেকে দ্বিতীয়। কিন্তু মজার বিষয় দ্বিতীয় স্তর থেকে ঘুম ও জাগরণের মাঝামাঝি স্তরে না গিয়ে চলে যায় REM-এ। এটি ঘুমের সবচেয়ে মজার স্তর। এ অবস্থায় যদি কাউকে দেকে তোলা হয়, তাহলে প্রায় সবাই মনে করেন তারা কিছু একটা স্বপ্ন দেখছিল। মূলত এই স্তরের মধ্যদিয়ে যাওয়ার সময়ই মানুষ রাতের প্রথম স্বপ্নটি দেখে। এক থেকে দশ মিনিট এই স্তরে থাকার পর আবার আগের মতো দ্বিতীয় তৃতীয় স্তর থেকে চতুর্থ স্তর বা গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পরো। প্রতি ৯০-১২০ মিনিট পর পর মানুষ এই পুরো চক্রটির ভেতর দিয়ে

যায়। এক্ষেত্রে প্রথম REM এর তুলনায় দ্বিতীয় REM এর স্থায়িত্ব আরও বেশি হয়। আবার দ্বিতীয় থেকে চতুর্থ বড় হয়। এভাবে বাড়তে থাকে।^[১]

এই REM বা রেপিড আই মুভমেন্ট আমাদের জন্য নিঃসন্দেহে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মানুষের

[১] Sciencedaily, Ektukhani biggan

সারাদিনের স্মৃতি পাকাপোক্তভাবে সাজিয়ে
রাখা এবং নতুন নতুন নিউরনের মাঝে সংযোগ
স্থাপনের জন্য এটি সাহায্য করে।

সবই তো বুবলাম, কিন্তু অনেকে একটা প্রশ্ন
করে থাকে, একজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের দৈনিক
কত ঘণ্টা ঘুমানো প্রয়োজন?

আসলে এই প্রশ্নের কোনো নির্ধারিত উত্তর
নেই। প্রত্যেকের ঘুমের চাহিদা ভিন্ন। তোমার
যতটুকু প্রয়োজন ততটুকুই ঘুমানো উচিত। তবে
বেশি ঘুমানো যেমন ক্ষতিকর, কম ঘুমানোও
ক্ষতিকর। যুক্তরাষ্ট্রে প্রতিবছর প্রায় এক লক্ষ
গাড়ি এক্সিডেন্ট হয় এই ঘুমের কারণে এবং
তাতে প্রায় দুই হাজারের বেশি মানুষ মারা
যায়।^[২] এ ছাড়াও অবাক করা বিষয়, পৃথিবীর
ইতিহাসের দুইটি ভয়ংকর নিউক্লিয়ার বিস্ফোরণ
হয়েছিল ঘুমের কারণেই। ভোরাতে চেরনোবিল
এবং থি মাইল আয়ারল্যান্ড নিউক্লিয়ার প্লান্টের
কর্মকর্তারা যখন ঘুমের কারণে বিপদ সংকেত
উপেক্ষা করে তখনই হয়ে যায় এই ভয়ংকর
দুর্ঘটনা।^[৩]

[২] Sleepfoundation.org

[৩] Wikipedia (En)

অনেকের মধ্যে রাত জেগে পড়ার অভ্যাস
আছে; বিশেষ করে শিক্ষার্থীদের মাঝে। কিন্তু
এটা মোটেও স্বাস্থ্যকর কোনো কাজ নয়। বিশ
স্বাস্থ্য সংস্থার ক্যান্সার বিষয়ক গবেষণা বিভাগ
ইটারন্যাশনাল এজেন্সি ফর রিসার্চ অন
ক্যান্সারের তথ্যমতে, যখন সুর্যের আলো থাকে
না, তখন শরীরকে কাজ করতে বাধ্য করা
বা জাগিয়ে রাখা শরীরে মেলাটনিন হরমোন
তৈরিতে বাধা সৃষ্টি করে। আর এই মেলাটনিনই
মানুষের দেহে টিউমারের বৃদ্ধিকে রোধ করে।
ফলে তাদের ধারণা, রাত জাগা মানুষদের
ক্যান্সার হওয়ার ঝুঁকি বেশি।^[৪] অর্থাৎ রাতের
ঘুম অত্যন্ত প্রয়োজনীয় এবং এটি কোনোভাবেই
দিনের বেলায় ঘুমিয়ে পুষিয়ে নেওয়া যায় না।

‘তিনিই স্বীয় রহমতে তোমাদের জন্যে রাত ও
দিন করেছেন, যাতে তোমরা তাতে বিশ্রাম গ্রহণ
করো ও তাঁর অনুগ্রহ অঙ্গেগণ করো এবং যাতে
তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো।’^[৫]

মুচ্ছি থামা সুন্নাথ!

শিক্ষক : এমন এক প্রজাতির মাছ আছে, যারা
সাঁতার কাটতে পারে না। বলো তো কী মাছ?

ছাত্র : ডেড ফিশ, স্যার!

এক ব্যক্তি টানা দশদিন ঘুমায়নি, তার সাথে কী
ঘটেছিল জানো?

[৪] WHO

[৫] সুরা কাসাস, ২৮ : ৭৩।

-কিছুই ঘটেনি, লোকটি রাতে ঘুমাত।

বলো তো, রিমা কেন স্কুলে মই নিয়ে গেল?

কারণ, তার আম্বু বলেছে, সে আজ থেকে হাই
স্কুলে পড়বে!



ক্যালিগ্রাফি

'ক্যালিগ্রাফি আসন ভাব্যালি ২০২২' প্রতিয়ে শিশু তোমালোর ঘাসে বাপক সাজা ফেলো শারা এই
প্রতিযোগিতা অংশ নিয়েছিলে সবার চূঁচা দেখে সত্ত্বেও মুক্ত হয়েছি আমরা!

প্রতিযোগিতার বিষয় ছিল 'কৃতিক থেকে পর্যবেক্ষণ আচার, কীর্তনে 'বিশুভূষণ বাহনের
হার্দিক' অধ্যন' অসমাইল উপন্যাস (অসমীয়া গুণবাচক নথিসমূহ) নিয়ে ক্যালিগ্রাফি করা।

আমাকেই হয়তো ভাবছ, জ্ঞানুয়ারি চুলে 'গান্ধীজি হৈব কুব', ফলফল তো পাওয়া গেল বা। কোলে
ভাঙ্গা কি পাখিয়ে দেল?

না, না। তেমাদের কোলে ভঙ্গিয়া এখানেই আছে। মশাকাজাত, আমালের ক্যালিগ্রাফি এত সুন্দর ছিল
সে, আমালের সম্মানিত বিচারকে ভীতিহাতে হিমক্ষিপ থেতে হয়েছে, নিহংস চিঠীরখ করতে।

বিজয়নামে পুরষার দেওয়ায় কথা ধীকৃতে অনেক যাচাই-বাচাইয়ের পর পৌঁছনাকে বিজয়ী হিসেবে
বাছাই কর হওঁ ছে, কোট হাঁক পুঁত কাহ।

বিজয়ীরা অনে :



মালজিদা মোলগামা



যাদিয়া মিলিকা



মাহিদুর রহমান



আমাদুল্লাহ হালিল



আনিষ্পা হামেদ



মুহাজাবিল হায়লাত দিলা

এছাড় ৬ মোস্তা চিনের পক্ষ থেকে ঝোটি বন্ধ মেহজানিল ইসলাম নিমতকে (নথস ৩: 'আজ্ঞাফ' কা'লিদাস) পূর্ণপূর্ণ করা হবে।

বনামণা কল্যাণ Jimhouse Publication এর পক্ষ থেকে ১০৭ টাকা সম্মুগ্রে পৃষ্ঠা এ শীঘ্ৰই
পৌঁছে যাবে তোমাদের লিঙ্গান্ব ইনশা আল্লাহ। শব্দ বিজীৰ্ণ হৃত পাত্রানি, মন খারাপের আবেদ্যাবেই
করণ দেই। সমন্বে এবং অন্তক প্রতিবেচিত। নিম্ন হাজিল হলে তোমাদের মোস্তা ডাকিবা,
ইনশা আল্লাহ।

খনামীদ Jimhouse Publication কে কোথাও আওয়াজনে শোক ইসমে পাশে খাকার খনো
আখামীর এমন আজ্ঞা জনে কোনো সুবৃদ্ধ স্পলহ বস্তে চাইলে বোধারণ করুন আমাদের সাথে

খুনি মেঘের ভাঁজ

ওমর আলী আশরাফ

(ষষ্ঠ পর্ব)

میرزا الحنفی

ক঳োল খুব মনোযোগ দিয়ে আমাদের কথা শুনছে। আমাদের বলার ভেতর তার মনে কোনো প্রশ্ন জাগলে কথার শেষে জিজ্ঞেস করে নিছে। আমাদের বক্তব্যে—‘একজন সাহাবিয়া উম্মু আবদুল্লাহ বিনতু হানতামা

(রদিয়াল্লাহু আনহা)-কে এই রকম মক্কা ত্যাগ করে চলে যেতে দেখে উমার (রদিয়াল্লাহু আনহু)-এর বিবেক নড়ে উঠে’—এর সুর ধরে জিগ্নেস করল, এই সাহাবিয়া কি পর্দা করতেন না?

ক঳োলের প্রশ্ন শুনে আমরা তিনজনই মুচকি হাসলাম। ভাবটা এমন, বয়েসে যোলো হলে কী হয়েছে, এ তো দারুণ চালু! আমরা উভর করলাম, তখনো পর্দার বিধান আসেনি। পর্দার বিধান এসেছে আল্লাহর রাসূল ﷺ মক্কা থেকে মদিনায় হিজরতের পরে। তবে অবশ্যই তখনো; সেই কুফর-বেষ্টিত পরিবেশেও তারা শালীন পোশাকই পরতেন। মানুষের স্বভাবসূলভ লজ্জার আড়ষ্টতা সেকালের মুসলিম নারীদের ছিল।

উভর দিয়ে আমরা আবার মূল প্রসঙ্গে ফিরে গেলাম।

উমার (রদিয়াল্লাহু আনহু) ইসলাম গ্রহণের পেছনে মূল কারণ ছিল, আল্লাহ তাআলা তাকে হিদায়াত দিয়েছেন। আমাদের নবিজি ﷺ আল্লাহর কাছে দুআ করলেন, ‘আবু জাহল ইবনু হিশাম অথবা উমার ইবনুল খাতাবের মধ্যে যে আপনার বেশ প্রিয়, তাকে দিয়ে আপনি ইসলামকে শক্তিশালী করুন।’

আল্লাহ তার প্রিয় হাবীবের দুআ করুল করেছেন। রাসূলের দুআর প্রভাবে উমারের অস্তরজুড়ে তোলপাড় শুরু হয়ে গেল। যার প্রকাশ দেখা গেল, সাহাবিয়া কুরাইশের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে মক্কা ত্যাগ করে হিজরত করছেন দেখে

উমার দৃঢ়থিত হলেন। উম্মু আবদুল্লাহ বিনতু হানতামা (রদিয়াল্লাহু আনহা)-এর বক্তব্যে সে তথ্য দারুণভাবে উঠে এসেছে। তিনি বলেন, ‘আমরা হিজরতের উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছি। নির্দয়ভাবে যে উমার একদিন আমাদের ওপর খড়গ চালিয়েছেন, সেই তিনি আজ আমাকে জিগ্নেস করলেন, আপনিও কি চলে যাচ্ছেন, উম্মু আবদুল্লাহ?’

আল্লাহর রাসূলের দুআ বৃথা যেতে পারে না। এখানেই উমার (রদিয়াল্লাহু আনহু)-এর বিশেষত্ব ফুটে উঠে। মক্কার আর সব বাঘা-বাঘা নেতা মোড়ল থাকতে নবিজি ﷺ দুআ করলেন আবু জাহল ও উমারের নাম নিয়ে। আল্লাহ তাআলা দুজনের মধ্য থেকে কবুল করলেন উমারকে!

**ইসলামকে মহিমাপ্রিত করতে,
শক্তিশালী করতে, দিগ্দিগন্তে
ছুটিয়ে দিতে আল্লাহ তাআলা
কবুল করলেন উমারকে।**

আমরা আগেই আলোচনা করেছি, সেই অন্ধকারকালে মক্কার যে-ক্যাজন মানুষ লেখাপড়া জানতেন, উমার ছিলেন তাদের একজন। উকায়, যুল মাজায় প্রত্বতি মেলায় ঘুরে ঘুরে তিনি পণ্যের সদাই করতেন। সেসব মেলায় উপস্থিত থাকত ইতিহাস ও অতীত-কথনে সমৃদ্ধ বাকপটু ব্যক্তিরা। তারা যেখানে কথার ঢালি সাজিয়ে বসত, লোকজনে জটলা বেঁধে যেত সেখানে। উমার (রদিয়াল্লাহু আনহু) তাদের কথা মনোযোগ দিয়ে শুনতেন এবং এভাবে নানান অঞ্চলের মানুষের সঙ্গে মেলামেশা ও তাদের বক্তব্য শুনে আববের ইতিহাস, সংক্ষিতি, আভিজ্ঞাত্য বিষয়ে তিনি সমৃদ্ধ হয়ে উঠেন। জাহিলিয়াতের আচার-অনুষ্ঠান, সংস্কৃতি-বিশ্বাস তার ভেতর শক্তভাবে বসে গিয়েছিল।

তাদের মন, মনের কথন, গতি-প্রকৃতি খুব সচেতনভাবে তিনি ঠাহর করতে পারেন। ধীরে ধীরে বুদ্ধি ও বক্তব্যে তিনি সেকালের আরবে সেরাদের একজন হয়ে উঠেন। কোথাও দুপক্ষ বিবাদে জড়িয়ে গেলে তাকেই সমাদরে ডাকা হতো সমাধা করে দেওয়ার জন্য। তার বক্তব্য ও সিদ্ধান্ত সবাই মেনে নিত।

এই শক্তিশালী ব্যক্তিটি যখন জাহিলিয়াতে ভুবে ছিলেন, তখন যেমন কট্টর মুশরিক ছিলেন, মুসলিমদের পেটাতেন, ইসলামের বিরোধিতা করতেন, আল্লাহর রাসূলের দুআয় ইসলাম প্রহণের সঙ্গে সঙ্গে তিনি সম্পূর্ণ বদলে গেলেন। যে উমারের নিপীড়নে মুসলিমরা মক্কা ছাড়তে বাধ্য হয়েছেন, সেই উমারই সাহাবিয়া উম্মু আবদুল্লাহ বিনতু হানতামা (রদিয়াল্লাহু আনহ) দের হিজরত দেখে দুঃখিত হয়ে পড়েন। তারপর ইসলাম প্রহণ করে নিজেই মক্কা ত্যাগ করে মদিনায় হিজরত করেছেন।

বলতে বলতে একত্রে অনেক কথা বলে আমরা থামলাম। দেখলাম, ক঳িলের চোখ দুটো কেমন আর্দ্ধ হয়ে আছে। একজন অমুসলিমকে ইসলামের দাওয়াত দেবার এই তো মোক্ষম সময়। বাইরে তুমুল বেগে বইতে থাকা প্রবল ব্যষ্টি ও সন্তুষ্ট আমাদের এই অনুধাবনে সায় দিচ্ছে। বাতাসের তীব্র ঝাপটায় ঠায় দাঁড়িয়ে থাকা নারকেল গাছগুলো খুব দ্রুত মাথা দোলাচ্ছে। নারকেলের চিরল চিরল পাতাগুলো তির তির করে কাঁপছে। আমরা যে বারান্দায় বসে কথা বলছি, তার চিনের চালে বানবন শব্দে ব্যষ্টির ছন্দ বইছে। বাতাসে উড়তে থাকা জলের ক্ষুদ্র রেণু শরীরে শিহরণ তুলে দিচ্ছে।

আমরা এবার গলার আওয়াজ আরও বড় করে ক঳িলের মাকে শুনিয়ে বলতে লাগলাম, উমার (রদিয়াল্লাহু আনহ)-কে আল্লাহ কবুল করেছেন—উমার ছিলেন জ্ঞানী, বুদ্ধিমান

এবং সাহসী। উমারের একটি হাদয় ছিল, তিনি সত্যমিথ্যার তফাত অনুভব করতে পারতেন। এ কারণেই তাঁকে ‘আল-ফারুক’ বলা হয়। এটি এমন

এক তীক্ষ্ণ উপাধি, যে-কাউকে এই গুণে ভূষিত করা যায় না। আল্লাহর রাসূলের সাহাবিয়া সত্যমিথ্যা বুবাতে পারতেন; কিন্তু সবাই এই উপাধিতে ভূষিত হননি। উমার (রদিয়াল্লাহু আনহ) জাহিলিয়াত এবং ইসলামকে কেমন গভীর থেকে বুবেছিলেন, তার একটি বিখ্যাত উক্তি থেকে সেটা বোঝা যায়। তিনি বলেছিলেন, ‘একটা সময় আসবে, যখন ইসলামের বন্ধনগুলো একে একে খুলে যাবে। কারণ, মুসলিমদের মধ্যে এমন একটা প্রজন্ম বেড়ে উঠবে, যারা জাহিলিয়াতের গতি-প্রকৃতি বুবাতে পারবে না।’

এবং সেই একটা সময় এখন পৃথিবীতে চলছে। আমাদের বন্ধনগুলো ছিন্নবিছিন্ন হয়ে পড়েছে। কারণ, আমরা জাহিলিয়াতের গতি-প্রকৃতি যেমন বুঝি না, সত্যও উপলব্ধি করতে পারি না। উমার (রদিয়াল্লাহু আনহ) ছিলেন, বুদ্ধিমান, সাহসী এবং যথার্থ সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম ব্যক্তিত্ব। যার ফলাফল, রাসূলের দুআটিতে আবৃ জাহলের নাম আগে থাকলেও সে হিদায়াত পায়নি, পেয়েছেন উমার ইবনুল খান্দাব (রদিয়াল্লাহু আনহ)। এখন তোমাকে বুবাতে হবে, তুমি কি সাহসী, না কাপুরুষ? বুদ্ধি-বিবেচনায় আর দশজন থেকে তোমার বিশেষত্ব কী? আমাদের কর্তব্য ছিল তোমাকে সত্যমিথ্যার পার্থক্যটা ধরিয়ে দেওয়া, আশা করি তুমি গোটা বক্তব্য বুবাতে পেরেছ!

(চলবে, ইনশাআল্লাহ)

আগের পর্বঃ

<https://tinyurl.com/khulimegh>

কুইজে কুইজে

সীরাত

পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মানু হলেন আম দূর নবিজি মুহাম্মদ (ﷺ)। তিনিই
গোমানের শীঁ বশের এন্টেনা আমরা। তাঁর পেছানে পথই এন্টেনা সত্তা,
সচিক ও মুক্তির পথ। আর তাঁর তাঁর জীবনী নিয়ে আমরা জরি রেখেছি
ধর্মবাহিক কুইজে প্রতিযোগিতা ‘কুইজে কুইজে সীরাত’।



নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর পাইয়ে সেরা পাঁজন ক্লিক কাও ৫০০ টাকা
কাম মেটি ১৫০০ টাকার পুরস্কার। উত্তর পাইয়ে quiz.shohin@gmail.com
ইমেইল দিবালাই। উত্তর পাইয়ের মুক্তি সময় ১০ জুন, ২০২২।

- ১** জাহিলি যুগে সম্পন্নের সিংহভাগ কোন কাজে বাধ হতো?
- ২** বদানাতার কাঁচে কুণ্ডিলগুলি আবগুল মুক্তালিবের কী নাম দাখে?
- ৩** কিশোর অবস্থার নবিজি (ﷺ)-এর অবসাব ও বৈশিষ্ট্য দেখে কিছুন
গৰ্ভাজক লাইব্রেরী কী বলেছিল?
- ৪** কানা ঘরের হায়রে আসওয়াদ স্থাপন সম্পর্কিত বিবাদ মৌমাঙ্গা সমাধানের
প্রস্তাব কে করেছিল?
- ৫** ক্রাইস্টা ১ম কানাগৃহ সংঘাতের উদ্বোগ কি হিল,
তখন মুহাম্মদ (ﷺ)-এর বয়স কত ছিল?

সালের গত সংখ্যার কুইজে রেটা সচিক উত্তর প তিতেজিসেন তাঁরের মধ্য থেকে দৈব জ্ঞানের কুম কুম
মেটি ১৫ টাকা প্রথম মিশন করা হওয়া। ১৫ মিশনের কুইজে এর উত্তর:

১। রখন তার বয়স অৱী সজ্জা দুই মাস দশ দিন। (পৃষ্ঠা ১০) ২। কিলার দ্রুব। (পৃষ্ঠা ৮৭) ৩। হয়ত শান্তি,
আনু বন্দন, অনীক, (পৃষ্ঠা ১০১) ৪। সাপ-অমিন। (পৃষ্ঠা ১২) ৫। কিন বজ্জি। (পৃষ্ঠা ১০১)
নথি: আজ র'ইল মানবত্ব - তাঁরইদ পার্সিস্টেশন

সচিক উত্তরপাত্র দেব মধ্যে বিষয়টি বা কুমেন:

যিস্মায়াদ উপ কল অন্দির, অসমুর ইনসাফ নিলাত, ব'হু ফরাল, সিয়াম স'লেয়ার, সেলত

মিশনে প্রথম মিশন প্রথম quiz.shohin@gmail.com এবং উত্তরে নিউজেন্স প্রথম মাস, মুক্তি নাম্বার এবং
তিকানা পাই কুইজে হবো।

ମନୋବିଦ ଭାଇୟା,
ସମସ୍ୟାଯ ଆଛି

ଶ୍ରୀମତୀ ପ୍ରମିଲା
ପାଠ୍ୟକାରୀ ମହିଳା



প্রথম প্রশ্ন : মনোবিদ ভাইয়া, আসসালামু আলাইকুম। আমার বয়স ১৭ বছর। আমি একাদশ শ্রেণিতে পড়ি। একটা বিষয় নিয়ে খুব সমস্যায় আছি, তা হলো আমি আমার মনের কথা বুঝিয়ে বলতে পারি না। ছোটবেলা থেকেই কারও সাথে মন খুলে কথা বলতে পারি না। আমার সহপাঠীদের সঙ্গেও মিশতে পারি না। কোনো বিষয় মানিয়ে নিতে অনেক কষ্ট হয়। আমি প্রায় সব বিষয় নিয়েই ভয় পাই। আমি বড় হয়ে যাচ্ছি কলেজে পড়ছি, ইদনীং তাই এগুলো নিয়ে খুব বেশি দুশ্চিন্তা করি। আমার মাত্র একজন বন্ধু আছে, আমি তার সঙ্গে বসেও কথা বলতে পারি না। খুব কষ্ট পেলেও কাউকে না বলে একা একা সহ্য করি।

উত্তর : তুমি সন্তুষ্ট সোশ্যাল আংজাইটি ডিজঅর্ডার নামক একটা মানসিক সমস্যায় ভুগছ। এই সমস্যার কারণে সামাজিক সম্পর্কগুলো মেইনটেইন করা কঢ়িন হয়। নিজের আলোকিক কর্ম থাকে। সাথে তোমার পরিবারে ছোটবেলায় তুমি কেবল পরিবেশে বেড়ে উঠেছ সেটাও বিস্তারিত দেখতে হবে। কাউন্সিলিং গ্রহণ করলে তোমার সমস্যাটার সমাধান সম্ভব।

দ্বিতীয় প্রশ্ন : প্রিয় মনোবিদ ভাইয়া, আমি শাওন। আমার বয়স ১৪। আমার সমস্যাটি গুরুতর। আমার ছোটবেলা থেকেই সবসময় কিছু-না-কিছু খেতেই মন চায়। আমার ওজন

অনেক বেড়ে গিয়েছে। এজন্য বাবা-মা ও অনেক বকাবকি করেন। আমি মাদরাসার আবাসিকে থেকে পড়াশুনা করি। তাই ইচ্ছেমতো বাইরের খাবার খাই। বাড়িতে গেলে মা খাবার লুকিয়ে রাখে, তাও আমি আমার চাচিদের ঘরে গিয়ে খাই। কোনোভাবেই নিজেকে আটকাতে পারি না। খেলাধুলা করতেও ভালো লাগে না। ব্যায়াম করতে গেলে অনেক ক্লাস্ট হয়ে যাই। ডায়েট করতেও ইচ্ছে করে না। আশেপাশের সবাই অনেক কথা শুনায় আমাকে। এসবের জন্য আমার অনেক সমস্যা হচ্ছে।

উত্তর : হরমোনজনিত কিছু সমস্যার কারণে এই ধরনের লক্ষণ দেখা দিতে পারে। এজন্য হরমোনগুলো পরীক্ষা করে দেখা জরুরি। এই সমস্যাটি সাধারণত থাইরয়েড হরমোন, কটিসল হরমোনের কারণে হতে পারে। বাড়তি ওজনের কারণে তোমাকে যে বিভিন্ন মন্তব্য শুনতে হয়, সেটা তোমার হতাশা বাড়িয়ে দিতে পারে এবং সমস্যাটির মাত্রাও বেড়ে যেতে পারে। তাই উপযুক্ত চিকিৎসা নেওয়া প্রয়োজন।

উত্তর প্রদান করেছেন-

ডা. মাসুদ রানা, রেসিডেন্স, ফেজ বি, মনোরোগ বিদ্যা বিভাগ, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়।



মাধ্যাপী কাব্য

বন্ধনাব সোহান

আশু তুমি আর দেবো না
ভাল্লাগেল ঘাষ
মাংস আমার বেজায় প্রিয়
লাত ইট ডেরি মাচ।

হোক ঘুরগি কিংবা খাসি
টটিকা, গরম কিংবা বসি
হাঁস, কবুতর কিংবা গরঃ
রান্টা মোটা কিংবা সুর
সবই ভাগো লাগে,
ভাতের ফোটে মাছটা পেলেই
গুছলে হাত রাগো।

এন্ট মানুষ

বন্ধনাব সোহান

আজ সকালে হাঁৎ করেই
প্রশ্ন মনে এলো
চিত্তির ভেতর এন্ট মানুষ
কেবল করে দেল?
কভ রকম কথা তদের
কভ রকম রূপ
লোতশেতিং এর বেলায় আবার
একেবাবেই চুপ!



হারানো বিজ্ঞপ্তি

বন্ধনাব সোহান

থরিওছে 'খুকেচুরি'
আৰ 'ফুলটোকা'
পিসি-টাব হাতে তাই
খেলে খুকি খোকা!
বাকি দেই মাঠিয়া
খেলবে কী? ধূধ
হারিয়েছে 'ছুয়োছুয়ী'
আৰ 'কুতকুত'!

মৃহৃ-১০

তানতিল্ল প্রাণীন তচ

চৱকিৰ অফুৱস্তু তেল এসে ফুরিয়ে যায়;
এই সমীয়ে
জীৱনেৰ অসীম পথ এসে ছিলিয়ে যায়
সাড়ে তিন হাতেৰ ঘৰো।



ମୟୋ ମୁଦ୍ର

ସାବିତ ହାତାନ

ମାତ୍ରେ କେବେ ଗେଛେ କଣ ସମୟ ଖାତେ
ହୃଦୟର କୁଦ୍ର ବାଟିର ହତନ -
ହିନ୍ଦୁ ବସନ୍ତ ନାସଲେ ସମୟର ହାରିଯେ
ବାତ୍ରୀ କଶାର ଏକକଣେ ହାଜରାଧାଳ
ମହାଦେଶ ହେଉ ଥାବେ ଶିଶୁ ।
ମେଘନିର ବିରଞ୍ଜ ପାତାର ମତନ ବାବେ
ଗେଛେ ସମୟ ପଥର ଶିତେ,
ଭାଷା ବେଢାର ଫାଁକ ବେଯେ ଶୂରୁ ଉଠେଛେ
ଆବାର ଖାଇ କେବେ ଗପାର ମତେ ଲଖା
ହୁଅ ହୁଅ ନିଭେଦ ଶିଯେହେ ନିଭୁତେ ।

ଥାତ୍-ମାତ୍ରେର ବାଧ କେତେ ଗତ ହେବେହେ
ସମୟର କଣ ଜାଲୋଜ୍ଜାସ,
ସମୟର କେବେହେ କଣ ପୁଣିର ପତା
ହିତେଗେପୋ -

ଧୂଲୋକେ ମିଶେ ଦେଲୋ ବ୍ୟବିଳନ,
ତେଜାର ପଶମେର ମତନ ଅଗାଧିତ ସମୟ
ମିଲିଯେ ଗେଛେ ଦେଖୁ ଛେଦ୍ରା ଲୌକାଳ
କେବେ,

ଶରତେର ଶେତେର କାଶଫୁଲ ହେଁ ଝାପଟା
ନାତାନେ ମିଲିଯେ ଗେଛେ ଐ ଦୂରର
ଆକଶେ ।

ଏକଟା ଚିଲ ଉତ୍ତରେ ଉତ୍ତରେ ଯେମନ ମେଧେର
ହାତୋ ମିଲିଯେ ଯାଏ,
ଯୋଗର ଭେତର ଶଳିକ ପହିର ଦୁଟା
ଡିଲେର ନୀଳାଭ ଖୋଲନ ଫେଟେ ନୃତ୍ୟ
ଅତିଥିର ଆଗମନ ହେ; ପତଶତ ଦେବେର
ଅଗୋଚରେ ।

ଟାଙ୍କଟାନ ଚାନ୍ଦାତୁତେ ଏକନିକ ଗଭିର ଦାଗ
ପଥେ, ତିରିଥାତ ଜେଗେ ଉଠେ
କୁଟୁମ୍ବ କଲୋ ଚାଲ ବିବର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ -
ସଫେଦ ରଙ୍ଗ ହେବେ ନେହ ଚାରେ ମୁଖ,
ସର୍ବଜ ଗାହଟା ମରେ ଯାଏ ଟିକାନା ହରାନୋ
ଚିଟିର ଥାବେ ।

ସମୁଦ୍ରର ଉତ୍ତାଳ ଜାଲେ ବେଡାରେ ନବିନେର
ଭାଷ ଭେଲା କେବେ ହୁଏ ଅଜାନ
ଦ କୁଣ୍ଡେର ତରେ,
ଦେଖାବେଇ କଣ ଦନ୍ତବାହୀନ ସମୟ ହରିଯେ
ଗେଛେ ଜୀବନେର ମାନଚିତ୍ର ଛେଡେ ।

କଙ୍କାଳେର ଦେବାଳେ ମାଟିର ଦାଗ ପଢ଼ର
ଆଗେଇ;

ଟାଙ୍କଟାନ ଚାନ୍ଦା ସାନ୍ତ୍ରେର ଅଣ୍ଣିଲେ ପୁଢ଼େ
ଦୁଲେ ପାତାର ଆଗେଇ;
ଜହାଜି ତୁମ୍ଭ ମାନଚିତ୍ର ଏକେ ନ ଓ
ଜୀବନେର,
ନ ତେ ଇ ଜାରୋ ଇନ୍ଦ୍ରଜ୍ଞେର ଅଗୋଚରେ
ଏହ ମୁଦ୍ରର ମହିମାଗରେର ଉତ୍ତାଳ ଫେଉଥେ
ତେମାର ଜାହାଜର ଗନ୍ଧନା ହରାବେ ଶୁଦ୍ଧ
ତୋବର ଅଗେ ।

ପ୍ରଶ୍ନ: ବୈଶାଖେ ଶେଷଦିକେର ଏକ ରାତେ ଫାହାଦ
ତାର ତିନ ସଙ୍କୁଳେ ନିଯୋ ପରିବର୍କଣା କବଳ ଯେ
ତାଙ୍କେ ଜମାନୋ ଟାକା ଦିଲେ ଏକଟା ଫୁଟ୍‌ବଲ କିମନ୍ୟେ
। ତୋ ଯେହି ଡାରା ଦେଇ କାଞ୍ଚ, ତାରା ତାରଜନାଇ
ତାଙ୍କେ ଟାକା ଟେବିଲେ ରାଖିଲା । ଆଚମକା ଏକ
ବଞ୍ଚିପାତେ ହଜାର ବରେ ଲାଇଟ୍ ଅଥବା ମାୟ । ସବ୍ବନ
ଆବାର ଲାଇଟ୍ ବଲେ ଉଠିଲ ତଥମ ଦେଖା ଗେଲ ଯେ
ଟାକାଙ୍କୁଳେ ନେଇ । ତୋ କେ ଟାକାଙ୍କୁଳେ ହାତିଯେ
ନିଯୋଜେ ତା ଦେଇ କରାର ଜନ୍ୟ ଫାହାଦ ଏକ ଫୁନ୍ଦି
ଆଟିଲୋ । ମେ ଏକଟା ଡେଙ୍ଗ, ମରିଚାପଡ଼ା ବାଲଭିତେ
ଏକଟା ମୋରଗ ଦେଖେ ତା ଟେବିଲେର ଉପର ରାଖିଲା
ମେ ସବାହିକେ ଲାଇନେ ଦୀର୍ଘତାରେ ବଲାଇ । ଆମି ଏଥିମ
ଲାଇଟ୍ ବନ୍ଦ କରେ ନିବ । କିନ୍ତୁକୁଳ ପର ଆବାର ଲାଇଟ୍
ଅଳ କରିବ । ତୋମରା ସବାହି ଏବାବଥେ ଏକବାର କରେ
ବାଲଭି ସ୍ପର୍ଶ କରିବୋ । ତୋର ଯଦି ବାଲଭିତେ ସ୍ପର୍ଶ
କରେ, ତଥମ ମୋରଗାଟି ଡାକବେ । ଦେଖା ଗେଲ ସବାର
ସ୍ପର୍ଶ ବନାର ପାଇଁ ମୋରଗାଟିର କୋମୋ ସାଢ଼ାଶହ ନେଇ । ତଥମ ଫାହାଦ ସବାହିକେ ହାତ ଦେଖାତେ ବଲଗେ
(ମେ ହାତ ପରିଚାଳିକା କରେ ଫାହାଦ ବୁଲେ ଗେଲ ଯେ କେ
ଟାକାଙ୍କୁଳେ ହାତିଯେ ନିହେହେ ? ତୋମରା କି ବଲାତେ
ପାରିବେ ଫାହାଦ କିଭାବେ ବୁଝାତେ ପୋରେଛିଲେ
ବ୍ୟାପାରଟା ?

ପ୍ରଶ୍ନ: ଅସାନ ଓ ତାର ସଙ୍କୁଳ ମିଳେ ତାଙ୍କେ
ଆବେ ଏକ ପୁରନୋ ପ୍ରାସାଦେ ଗେଲ ରହିଲେର
ସଙ୍କାନୋ । ଏହି ପ୍ରାସାଦେର ବାଲିକ ଗଣିତପ୍ରେବି
ହତ୍ସାହୀ ତିନି ପ୍ରାସାଦେର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗଗାକ
ଗଣିତେର ସଥି ଦିଲେ ଜେବେଛିଲେନ । ତୋ ପ୍ରାସାଦେର
ଏକଟି ସିନ୍ଧୁକେ ଏହି ଧିଶାଟି ଛିଲ, “ ତିନଟି
ତାମିକ ଜୋଡ଼ ସଂଖ୍ୟାର ପ୍ରଥମ ଓ ତୃତୀୟଟିର
ଶୁଣକଳ ୨୫୨ ହୁଲେ ତାମିକ ଜୋଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ତିନଟି



କିଶୋର ବୟାସେ ଗୋହେନ୍ଦ୍ରାଗିରି
କରିବେ କେମନ ଲାଗେ ? କୁବ
ଭାଲୋ ଲାଗେ ନିଶ୍ଚଯିତା ତୋମାଦେର
ଗୋହେନ୍ଦ୍ରାଗିରି ପ୍ରତିଭା ବାଲାହି
କରିବେ ଆବରା ନିଯୋ ଏମେହି ସାମାବହିକ
ଆଯୋଜନ- ରହିଲାଇଟ । ରହିଲାର ଜଟ କୁଳେ
ପାଇଁଯେ ଦାଖ୍ଲେ quiz.sholo@gmail.com ଏଇ
ଟିକାନାର । ଆର ଦେବା ପାଇସନ ଗୋହେନ୍ଦ୍ର ଜିତେ
ନାହିଁ ୧୦୦ ଟାକା କରେ ପୁନରକାର ।

ଉତ୍ତର ପାଠିବେ ହୁଲେ ୧୦୪୩, ୨୦୨୨ ଏର ମଧ୍ୟେ ।

“ରହିଲାଇଟ” ଏଇ ବିଜ୍ଞାନୀଦେର ନାମ ଦେଖ୍ଯା ହେଲୋ ।
ମାତ୍ରମୁକ୍ତ ଇଲ୍‌ମାନ, ମୁହାମୁନ ମିସବାହିଲ ହାସାନ ମାରକ, ମାତ୍ରମୁକ୍ତ ମୁନଜିବାହ, ମୁହାମୁନ ଇତ୍‌ସୁଫ ଆମିନ
ସାକିବ ଶେଖ

ବିଜ୍ଞାନୀଦେର ନାମ quiz.sholo@gmail.com ଏଇ ଇମେଲେ ନିଜେଦେର ନାମ, କେମନ ନାହାର
ଏବଂ ଟିକାନା ପାଠାତେ ହୁଲେ ।

“

যতক্ষণ উচ্চাহ পশ্চিমের অনুসরণ করে যাবে উচ্চাহ ততক্ষণ
মানসিক দাসত্ব থেকে মুক্ত হতে পারবে না।

বিজিত সব সময় বিজয়ীর অনুসরণ করে। অনুসরণ করে
বিজয়ী হওয়া যায় না।

”

Ilmhouse Publication

এর সাড়াজাগানো বই 'চিত্তাপরাধ'।

চিত্তার কারাগার ভেঙে ফেলার জন্য এটিই হতে পারে
আপনার প্রথম হাতিয়ার।



ছোটদের খুলাফায়ে রাশিদা

৬ থেকে ১০ বছর বয়সী শিশুদের জন্য।



৪ টি বইয়ের সেট

মূল্য: ২০০০ টাকা



ছোট সোনামশিদের জন্য আমরা বিয়ে এসেছি 'ছোটদের খুলাফায়ে রাশিদা' সিরিজ। গল্পে গল্পে সোনামশিদের এবার জেলে যাবে সুপথপ্রাঞ্চ চার খনৌফার বর্ণাচ্চ জীবনী, যারা ছিলেন এই উচ্চাহর সেরাদের সেরা।

'আমার প্রথম পাঠগ্রাহ' সিরিজ

২ থেকে ৬ বছর বয়সী শিশুদের জন্য।



৪ টি বইয়ের সেট

মূল্য: ২০০ টাকা

এই সিরিজটি থেকে বাচ্চারা যেমন আ ক খ শিখবে, তেমনি শিখে যাবে আমাদের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও ধীনের উর্জাপূর্ণ কিছু বিষয়।

অমাদের সভ্য নিষিক্ষাকে মুক্ত হতে আসুন বকল অমাদের কেষিসন্তুষ্ট ফুল কিভাবিয়ান-এ।

ফিল্ট - <https://www.facebook.com/groups/kitabiyani>

[sondiponbd](#)

[www.sondipon.com](#)

sondiponprokashon@gmail.com

০১৭৭৯ ১৯ ৬৪ ১৯ , ০১৪০৬ ৩০০ ১০০

৩৪, Madrasa Market (1st Floor), Bangladesh

মন্দীপন
প্রকাশন লিমিটেড

